আনন্দমেলা
৪ নভেম্বর ১৯৮১ • আনন্দবাজার প্রকাশন •

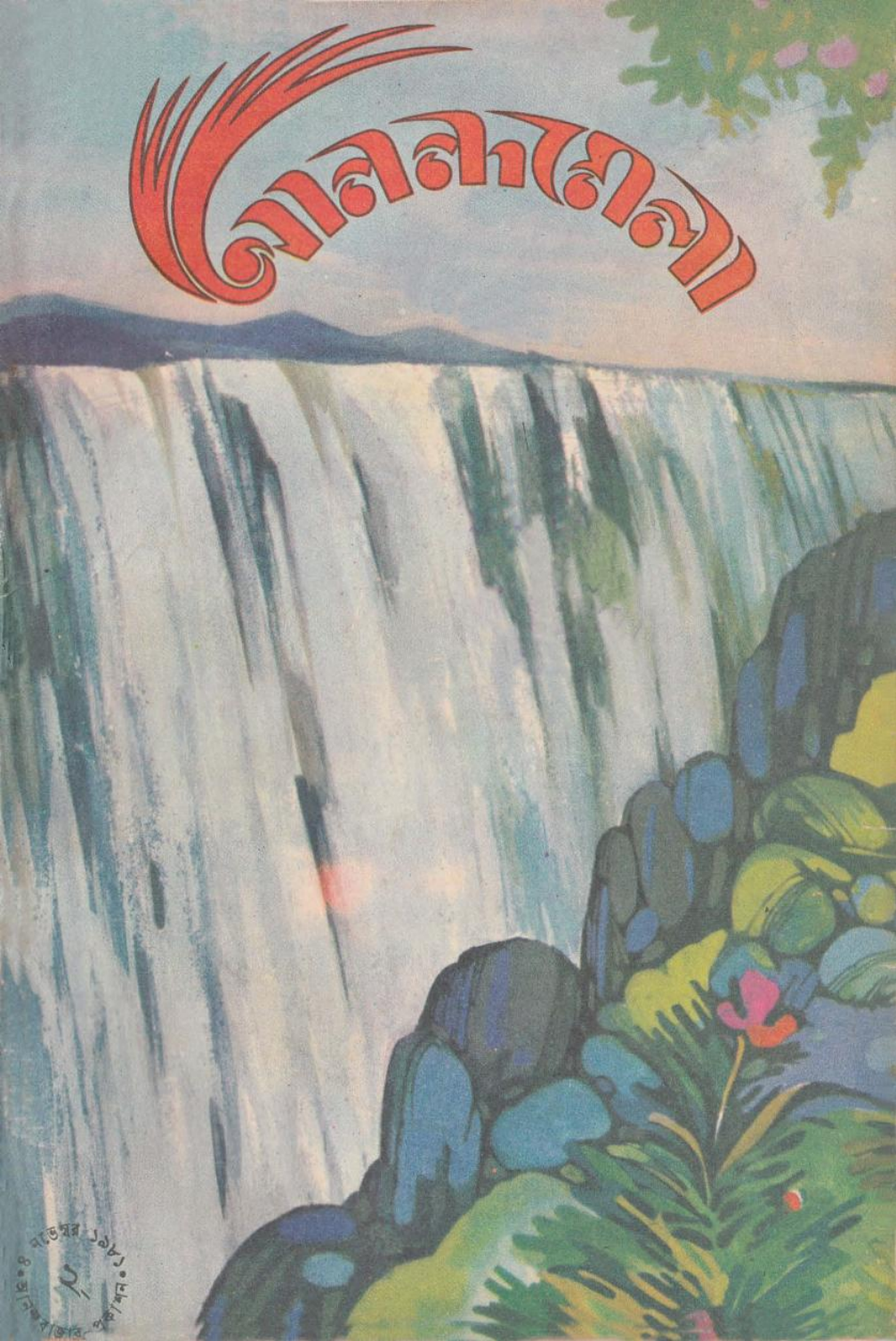

সঙ্গে ব্রিটানিয়া মারী!

মাণিক জোড় : চুমুক চুমুক চায়ের সঙ্গে মচমচে
খাবার··· ব্রিটানিয়া মারী বড় চমৎকার ! পরিপাটির
অতিথি সৎকার··· ব্রিটানিয়া মারী করে দেদার !
চায়ের সঙ্গে হালকা খাবার··· মারী বিস্কুটের
জুড়ি মেলা ভার !
সব সময় এক প্যাকেট কাছে রাখুন ।

ব্রিটানিয়া

মারী

বিস্কুট

চায়ের সাথী মচমচে বিস্কুট

ব্রিটানিয়া

ব্রিটানিয়া বিস্কুট সবচেয়ে সেরা

লিনটাস-BIN.MRE.6-1812 BG

আনন্দমেলা

১৮ কার্তিক ১৩৮৮ • ৪ নভেম্বর ১৯৮১ • ৭ বর্ষ • ১৭ সংখ্যা

ভ্রমণকাহিনী
মোসি-ও-তুনিয়া। ধ্রুব গুপ্ত ৪

উপন্যাস
সিসের আঙটি। বিমল কর ১৭
হারানো কাকাতুয়া। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৫৭

গল্প
গল্পের শেষে। বাণীব্রত চক্রবর্তী ১২
পৃথিবীর জন্মদিন। সন্ধ্যা দত্ত ২৪
চন্দনকাঠের বাক্স। অনীশ দেব ৪৯

ছড়া
বেঁটে বটুকের বেটি। শিবশম্ভু পাল ২৩
বানানের ছড়া। দেব সেনাপতি ২৭
বাঘ মরেছে। অরুণ সরকার ২৮
চার চিত্র। সাধনা মুখোপাধ্যায় ৫৩
দুষ্টু দুটো চড়াই। বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৫

স্মৃতিকথা
বসু-বাড়ি। শিশিরকুমার বসু ২১

খেলোয়াড়ের আত্মকথা
উইং থেকে গোল। পি. কে ৫৪

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২, টারজান ৬০
গাবলু ৬১, বাঘা ৬৫

লেখাপড়া
বাংলা বলো। বাচস্পতি ৬২
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৬৩

খেলাধুলো
যাঁরা আসছেন। মণীশ মৌলিক ৪৪
আবার ম্যাকেনরো। ডেভিড ম্যাকম্যাহন ৪৭

অন্যান্য আকর্ষণ
তোমাদের পাতা ৯, ছবির মজা ১৫
ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪

প্রচ্ছদ সুনীল শীল

সম্পাদক ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম দু' টাকা

বিমান মাশুল ঃ তিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

সর্দিতে একটি দিনও বৃথা না যায়

সর্দির কষ্ট থেকে আরাম পাওয়া যায়
সর্দির যে সব লক্ষণ সুন্দর দিনগুলোকে একেবারে মাটি করে দেয়, যেমন—নাক থেকে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথা ভার, গলা খারাপ, বুকে সর্দি বসা—তা থেকে আরাম পাবার উপায় আছে।

সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়ে সর্দি থামান
যেকোনো অসুখের মত চিকিৎসা করলেই যথেষ্ট নয়। সর্দির বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করুন যা একই সঙ্গে শরীরের সমস্ত আক্রান্ত অংশে কাজ করে।

কোল্ডরিন শুধু সর্দির জন্যেই
কোল্ডরিন সর্দির যাবতীয় কষ্টকর লক্ষণ থেকে আরাম দেয়। এর বিশেষ উপাদানগুলি সর্দিতে আক্রান্ত সমস্ত অংশে একই সঙ্গে কাজ করে। তাছাড়া, এতে যে ভিটামিন 'সি' আছে তা আপনাকে সর্দি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যোগায়। সর্দি হলে, তার চিকিৎসা সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়েই তো করা উচিত।

কোল্ডরিন
সর্দির জন্যে সর্দির বিশেষ ওষুধ

CASBC-64-192 BN

মোসি-ও-তুনিয়া

ধ্রুব গুপ্ত

গাড়ি চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকা থেকে রোডেশিয়া (এখনকার জিম্বাবোয়ে) সীমান্তের দিকে। আমরা সবে লুসাকা থেকে ২৮ মাইল দক্ষিণে এসেছি। ছোটরা উত্তেজিত, কখন সামনে দেখা দেবে পৃথিবী-বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত।

পিংকু বলল, "কাকু, ভিক্টোরিয়া ফল্‌স আর কত দূরে।"

রত্না, ওর দিদি, এখানেই আছে অনেকদিন। ছোট ভাই পিংকু পড়ে কলকাতায়, গরমের ছুটিতে মা-বাবার কাছে এসেছে। রত্না জবাবে বলল, "আরে পাগলা, সে তো এখনও অনেক দেরি।"

"পথেও দেখার মতো অনেক কিছু পাবে," বললেন পিংকুর বাবা।

বলতে না বলতেই দেখা দিল কাফুয়ে নদীর ব্রিজ। পেরিয়ে গিয়ে বেশ কিছুটা দূরে গাড়ি দাঁড় করানো হল। আমরা পিছু হেঁটে পৌঁছে গেলাম ব্রিজের ওপরে। ঘন নীল জল, নদীর দু পাশে পাহাড়। আগে এই ব্রিজে দাঁড়ালে অনেক জলহস্তী দেখা যেত। দূর থেকে মনে হত, কালো-কালো পাথরের চাঁই। এখন নদীতে জল বেশি হয়ে গেছে, তাই আর দেখা যায় না। "কেন হঠাৎ জল বেড়ে গেল?" পিংকু জানতে চাইল। বিজ্ঞের মতো জবাব দিল ওর দিদি। "তাও জানিস না। কিছু দূরেই যে নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। আমাদের মাইথন-পাঞ্চেতের মতো, তাই নদীতে এখন এত জল।"

কিছু দূর যাওয়ার পরে গাড়ির স্পীড কমিয়ে আনতে হল। রাস্তা সোজা চলে গেছে দক্ষিণে কারিবা বাঁধের দিকে। "আগে ওখানে গেলে না কেন?" পিংকু এ কথা বলতেই তার বাবা বললেন, "খুব কাছে নয়, ওখান থেকে ফিরে আবার ঠিক এইখানে এসে লিভিংস্টোন শহরে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে। ওটা পরের বারের জন্যে তোলা রইল।"

রত্না সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "লিভিংস্টোন কোথায় জানিস তো? আরে সেই শহরের কাছেই তো ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্।" ইতিমধ্যে আমরা ডানদিকের রাস্তা ধরে বেশ কিছু দূর পৌঁছে গেছি। হঠাৎ পিংকু চেঁচিয়ে উঠল "কী অদ্ভুত গাছ।"

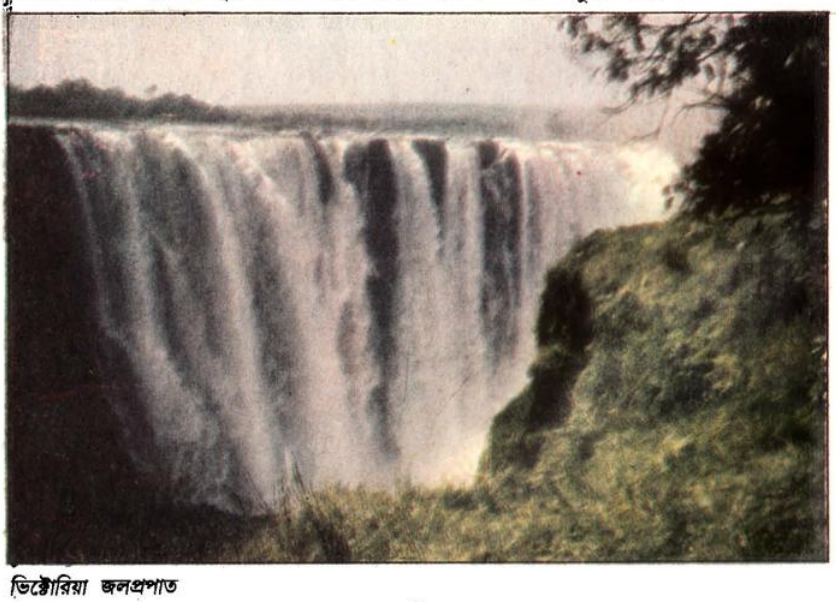

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত

"ওকেই বলে বাওবাব গাছ," পিংকুর বাবা বললেন। "ওর ফলও নাকি খেতে ভাল। বছরের বেশির ভাগ সময়েই ওর ডালে পাতা থাকে না।"

পিংকু হঠাৎ খুশি হয়ে বলল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ,মনে পড়েছে লিটল প্রিন্সে পড়েছি ওই গাছের কথা।"

আমরা উপত্যকার মতো একটা জায়গা দিয়ে ছুটে চললাম দক্ষিণ-পূর্বে। কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন নেই। বেশ কিছুটা যাওয়ার পরে রাস্তার দুধারে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের দেখা গেল। কেউ কুমড়ো, কেউ বেতের তৈরি ছোট ঝুড়ি, কেউ ব্যাঙের ছাতা (খেতে খুব ভাল), কেউ চিনেবাদাম (খুব হয় এ দেশের পূর্বরাজ্যে) নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিক্রি করার জন্য। কাছাকাছি গোটা-পাঁচেক ঘর। ওই হল গ্রাম। তারপর আবার ফাঁকা।

দক্ষিণ-জাম্বিয়াতে উত্তর-জাম্বিয়ার মতো গভীর বন চোখে পড়ে না। এদিকে শুধু লম্বা-লম্বা 'এলিফ্যান্ট গ্রাস', মাঝে মাঝে গাছ। মে মাসের মাঝামাঝি, তাই বর্ষার জলে চারদিকে সবুজের ছড়াছড়ি। আগস্টের পরে সব শুকিয়ে বাদামি হয়ে যাবে। এখানে নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে বর্ষা শুরু হয়। চলে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত। মে থেকে আগস্ট শীতের সময়। প্রচণ্ড শীত পড়ে মে মাসের শেষে আর জুনের প্রথমে। অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি গরমকাল।

কথা বলতে বলতে আমরা মাজাবুকা শহর পেরিয়ে দক্ষিণে চলেছি। মাজাবুকা বেশ পরিষ্কার শহর। বড়-বড় গাছ রাস্তার দুপাশ থেকে উঠে যেন চাঁদোয়া তৈরি করেছে। কোথাও কোনও কল-কারখানা নেই।

"এদেশে তো কল-কারখানা তেমন নেই, তবে লুসাকার স্টোরগুলিতে এতসব জিনিস আসে কোত্থেকে?" জিজ্ঞেস করলেন পিংকুদের মা। "বাইরে থেকে আসে। চিনি অবশ্য এ দেশেই তৈরি হয়। এখানকার আখ নিয়ে যাওয়া হয় উত্তরে তাম্রবলয় প্রদেশে, সেখানে রিফাইনারি আছে।" বললেন ওদের বাবা।

নাকাম্বালা শুগার এস্টেট পেরিয়ে বেশ কিছুটা চলে এসেছি। নজরে পড়ল "ওয়েলকাম টু মন্‌জে।" পিংকুর বাবা বললেন, "স্পীড কমাও।" আমি পিংকুকে প্রশ্ন করার সুযোগ না

লুসাকার বিখ্যাত কায়রো' রোড

দিয়েই বললাম, "এখানকার পুলিশ ভীষণ কড়া। ট্র্যাফিক রুলস না মানলে সোজা থানায় নিয়ে যাবে। এক রাত আটকেও রাখতে পারে। নিদেনপক্ষে জরিমানা করবে চার কোয়াচা, মানে চল্লিশ টাকা।"

রত্না চেঁচিয়ে উঠে বলল, "ওই দেখ রবীন্দ্রনাথের নামে স্কুল।" টেগোর স্কুলের সাইনবোর্ড সরে গেল পেছনে।

"এখান থেকে পশ্চিম দিকে কিছুটা গেলেই মন্‌জে ফ্ল্যাটস। প্রচুর হরিণ আর জেব্রা আছে সেখানে।" এবারও পিংকুকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ওর বাবা বলে উঠলেন, "পরের বার।"

খিদে পেয়ে গেছে সবারই। এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে খেয়ে নিলাম আমরা। আবার যাত্রা। চলেছি দক্ষিণ-পশ্চিম মুখ ধরে। চোখা বলে একটা ছোট শহরের মাঝখান দিয়ে গেলাম। দুধারে গুজরাটিদের দোকান। "একটা মজার কাণ্ড হয়েছিল জানো? আমি একবার কাবুয়ে শহরে এক জাম্বিয়ানের দোকানে

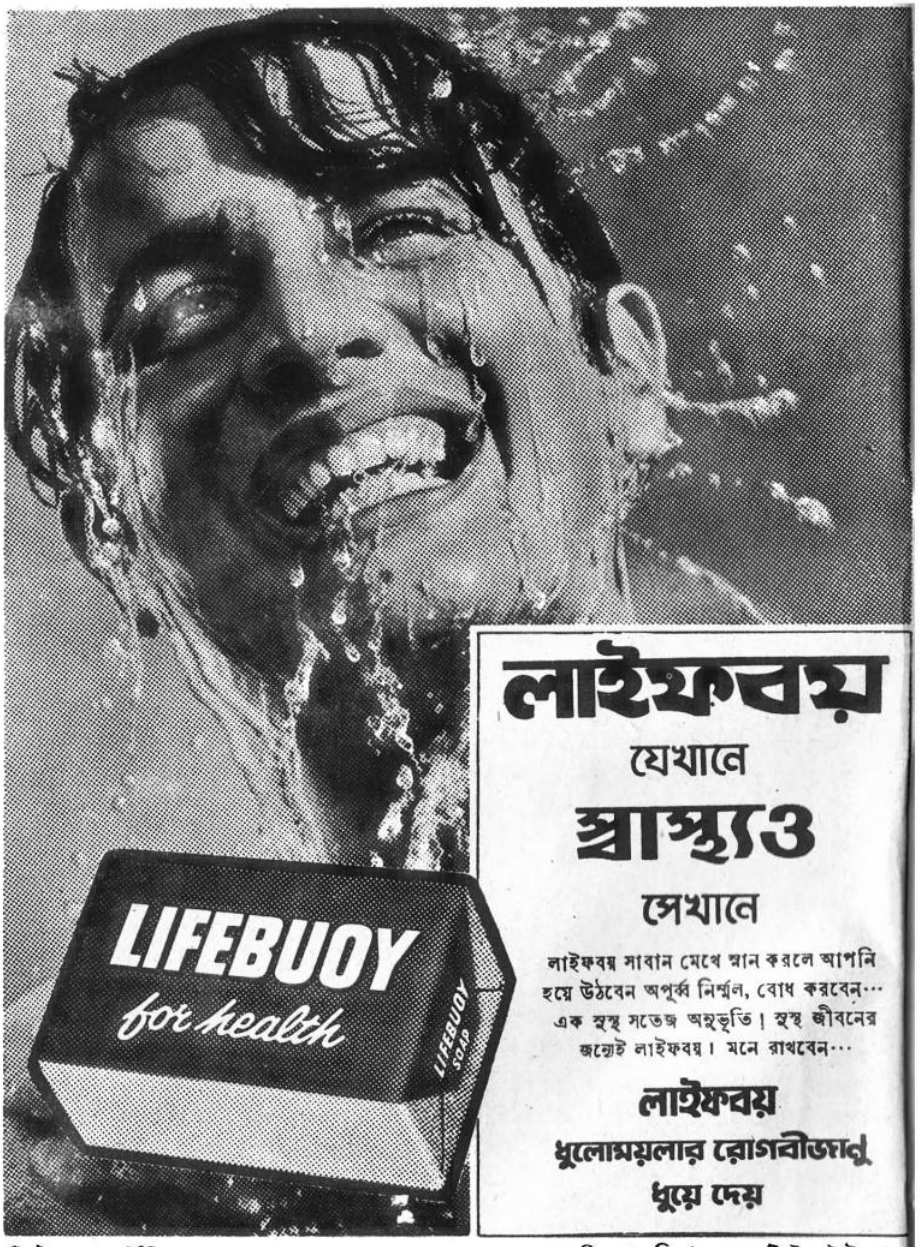

লাইফবয়

যেখানে

স্বাস্থ্যও

সেখানে

লাইফবয় সাবান মেখে স্নান করলে আপনি হয়ে উঠবেন অপূর্ব্ব নির্ম্মল, বোধ করবেন··· এক সুস্থ সতেজ অনুভূতি। সুস্থ জীবনের জন্যেই লাইফবয়। মনে রাখবেন···

লাইফবয়

ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়

সিনটাস-L. 75-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

ঢুকেছি কী যেন একটা কিনতে। আমাকে দেখেই দোকানিটি বলে উঠলেন, 'ইয়েস, হোয়াট ক্যান আই ড্ ফর ইউ মিস্টার প্যাটেল?' ওরা ভাবত, সব ভারতীয়ই বুঝি প্যাটেল। এখন অবশ্য সে ভুল ভেঙেছে।" বললেন পিংকুর বাবা।

পৌঁছলাম এসে কলোমো শহরে। এখানে একটা সেকেণ্ডারি স্কুল আছে, আর গোটাকয়েক দোকান। মাস্টারমশাইদের বাংলোগুলিতে বোগেনভিলিয়া আর গোলডেন শাওয়ার। "এ যেন ওয়াইল্ড ওয়েস্ট, অথবা দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ছোট কোনো রেল স্টেশন।" আমি এ কথা বলতেই পিংকুর বাবা বললেন, "ঠিক বলেছেন। এখানেও রাস্তার সমান্তরালেই রেল লাইন। দক্ষিণ-আফ্রিকার কেপ-টাউন থেকে শুরু হয়ে রোডেশিয়ার ভেতর দিয়ে লিভিংস্টোন শহর হয়ে সোজা চলে গেছে লুসাকার ওপর দিয়ে উত্তরে তাম্রবলয় পর্যন্ত। সেখান থেকে জাইরে আর অ্যাঙ্গোলার ভেতর দিয়ে চলে গেছে আটলান্টিক শহরের লোবিতো বন্দর পর্যন্ত।"

ছোটরা তাকিয়ে ছিল সামনের দিকে, কখন লিভিংস্টোন শহর আসবে।

হঠাৎ রত্না বলল, "ওই দেখ, ওই যে সাদা মেঘের মতো! ওই তো ভিক্টোরিয়া ফল্‌স!"

পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে জলকণা উঠে এসেছে মেঘের রূপ ধরে। শহর পেরিয়ে আর একটু গেলেই শোনা যাবে ভীম গর্জন। সেই জন্যেই স্থানীয় লোকেরা একে বলে মোসি-ও-তুনিয়া' (ধোঁয়ার বজ্ররব)।

সুন্দর-সুন্দর বাড়ি দুপাশে রেখে মসৃণ রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম শহরের কেন্দ্রে। ঝকমকে দোকান পেরিয়ে প্রপাতের পথ ধরতেই ডান দিকে দেখা গেল মিউজিয়াম। কিছুটা যেতেই পাশে দেখা গেল ক্রোম-ইয়ালো প্লেটের ওপর কালো রঙে আঁকা হাতি আর জলহস্তীর ছবি। "ওগুলো কেন?" পিংকু জিজ্ঞেস করতেই রত্না বলল, "তাও ধরতে পারিসনি? এখান দিয়ে ওরা রাস্তা ক্রস করতে পারে বলে ড্রাইভারদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।"

একটু পরে এল মারাম্বা কালচারাল ভিলেজ। এখানে আফ্রিকানরা নাচগান করে ওদের দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে বিদেশী টুরিস্টদের পরিচয় করিয়ে দেয়।

আমরা ফল্‌সে এসে গেছি। থাকব এখানেই গোলঘর রেস্ট হাউস-এ। ভেতরে ফ্রিজ আছে। চমৎকার বিছানা। দেয়াল ইঁটের তৈরি, কিন্তু ছাত এলিফ্যান্ট ঘাসের। আমাদের খড়ের ছাতের মতো। বাইরে রয়েছে বারবি-কিউ করার চুল্লি, সব দেখে ছোটরা খুব খুশি! আমরা একটু পরে ফল্‌সের কাছে গেলাম।

অবর্ণনীয় দৃশ্য। সাড়ে তিনশো ফুট ওপর থেকে জাম্বেসি নদীর জল লাফিয়ে পড়ছে গভীর খাদে। খাদের অন্য পারে বৃষ্টির মতো জল ঝরছে সব সময়। তাই সেখানকার গাছপালা সব সময় সজীব। খাদ থেকে জলকণা উপরে উঠে কৃত্রিম মেঘ তৈরি করেছে। সেই মেঘে দেখা যায় রামধনু।

"এর তুলনায় নায়েগ্রা তো কিছুই নয়," বললেন পিংকুদের মা।

"ঠিক বলেছ," ওদের বাবা বললেন, "সেটা তো মাত্র দেড়শো ফুট উঁচু। এর এমন বন্যপ্রকৃতি সেখানে পাবে কোথায়?"

এখান থেকে আমরা ফল্‌সের তিন ভাগের এক ভাগ দেখতে পাচ্ছি। বাকি দু ভাগ রোডেশিয়াতে। লিভিংস্টোন ওদিক থেকেই প্রপাতটি প্রথম দেখেন। ঠিক ওখানেই তাঁর একটি মূর্তি আছে। "এখন তো যাওয়া সম্ভব নয়, আমরা একাত্তর সালে দেখে এসেছি," আমি বললাম। "প্লেন বা হেলিকপ্টার থেকে সবটা দেখা যায়, দেখেছি আমাদের ভূগোল বইতে," টরটরিয়ে বলে উঠল রত্না।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি (ইস্টার্ন ক্যাটারাক্ট) তার উলটো দিকে সামনাসামনি ফল্‌স দেখা যায়, কিন্তু ওখানে যেতে হলে একটু শুকনো দিনে আসতে হবে। ওই দূরে রোডেশিয়া যাবার রেলব্রিজ। "চলো কাল সকালে আবার দেখা যাবে।" ফিরে এলাম আমরা। ক্লান্ত থাকার জন্যে ঘুমিয়ে পড়লাম চটপট।

সকালে উঠে দেখি পিংকু আর রত্না তৈরি। জলপ্রপাতে রামধনুর সাতটা রঙ দেখে আমরা গেলাম 'লুক আউট ট্রী'-তে। প্রকাণ্ড বাওবাব, পনেরো ফুট উঁচুতে একটা প্লাটফর্ম। লোহার মই বেয়ে উঠতে হয়। পিংকু আর রত্না তরতরিয়ে ওপরে উঠে গেল। পিংকু চেঁচিয়ে বলল, "ওই তো দূরে ফল্‌সের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।" ওখান থেকে গেম পার্কে।

লিভিংস্টোন মিউজিয়াম

গেম পার্কে ঢুকতেই এক জেব্রা এসে গাড়ির উইণ্ডস্ক্রীনে নাক লাগিয়ে দাঁড়াল। ওর জন্য বাদাম-টাদাম আনার কথা ভুলে গিয়েছি। গাড়ি থেকে নেমে 'হেট্ হেট্' করে তাড়ানো হল জেব্রাটাকে।

রোদ উঠেছে বেশ। "এই যে হরিণ," "ওই তো একটা জিরাফ," "ওমা! কটা বাঁদর দৌড়ে গেল," "ও বাবা! জীবনে এই প্রথম গণ্ডার দেখলাম!" এইসব বলে বাচ্চারা চেঁচাতে লাগল।

প্যাক্ড লাঞ্চ সঙ্গে ছিল। গাড়িতে বসেই আমরা খাওয়া শেষ করে গেলাম শহরের মিউজিয়ামে। সেখানে আছে জাম্বিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের পোশাক, আর আছে স্টাফ করা পশুপাখি। দক্ষিণ আফ্রিকাতে পাওয়া আদি মানব অস্ট্রালোপিথেসিনের একটা করোটিও আছে সেখানে।

মারাম্বা কালচারাল ভিলেজের কাছে যেতেই বাইরে থেকে ড্রামের আওয়াজ পাওয়া গেল। "জানো তো, এরা টকিং-ড্রামের সাহায্যে দূর-দূরান্তে খবর পাঠাত টেলিগ্রাফের মতো।" বললেন ওদের বাবা।

টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে দেখা গেল রঙিন পোশাক-পরা মেয়েরা নাচছে। তারপর এল একজন নর্তক। তার পরনে লম্বা লম্বা ঘাসের স্কার্ট। বুকের ওপরে নানা রঙের পুঁতির তৈরি বেল্ট, মুকুটে পাখির পালক। পায়ে ঘুঙুর, হাতে চামর। নাচের সঙ্গে বড় বড় ড্রাম বাজছে, আর বাজছে 'কাঠতরঙ্গ'। অদ্ভুত সুরেলা ধ্বনি।

নাচের আসরের বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলের ঘর তৈরির নিদর্শন আছে। কোনোটা মাটিতেই বসানো, কোনোটায় আবার মই বেয়ে উঠতে হয়। বেশির ভাগ ঘরই গোলাকার।

কিছুক্ষণ পরে আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে স্টীম বোটে চেপে ভাসলাম জাম্বেসির জলে। একটা জায়গায় দেখলাম কয়েকটি জলহস্তী জল নিয়ে খেলা করছে। একটা আবার বিরাট হাঁ করে উঠল। মনে হল, টুরিস্টদের ক্যামেরার সামনে 'পোজ' দিচ্ছে।

নদীর মাঝখানে দ্বীপ। হঠাৎ ওপারে দেখা গেল বিরাট এক হরিণ—ইম্পালা। নানা জাতের হরিণ আছে এদেশে—কুডু, ইম্পালা, রোয়ান, সেবল্ ইত্যাদি। "ওই দেখ দ্বীপ থেকে একটা কুমির নেমে গেল জলে"—চেঁচিয়ে উঠল পিংকু। রত্নার দৃষ্টি কিন্তু অন্যদিকে। অন্যদিকে একটা হাতি দাঁড়িয়ে আছে, সে তাই দেখছিল।

সন্ধেয় নদীর জল লাল হয়ে উঠল। লাল সিঁদুরের টিপের মতো সূর্য অস্ত গেল দেখতে দেখতে। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে সবাই মুগ্ধ। "সত্যিই বোঝা গেল কেন এই নৌকা-ভ্রমণকে 'সান-ডাউনার' বলে," বললেন ওদের বাবা।

চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। জ্যোৎস্নার আলোয় প্রপাতের রুপালি জল অন্য ধরনের সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। কারও মুখে কোনো কথা নেই।

পরদিন ফেরার পালা। পিংকু গাড়ির পেছনের কাচ দিয়ে চেয়ে রইল মেঘের মতো সাদা ধোঁয়ার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "আবার আসব মোসি-ও-তুনিয়া।"

হাঁসের দল

আমাদের পুকুরেতে
জল থৈ-থৈ করে
আমার পোষা হাঁসের দল
সেথায় খেলা করে

ছবি ও লেখা সঞ্জীব বসু (বয়স ৭)

ছবি এঁকেছে তুলি লাহিড়ী (বয়স ৫)

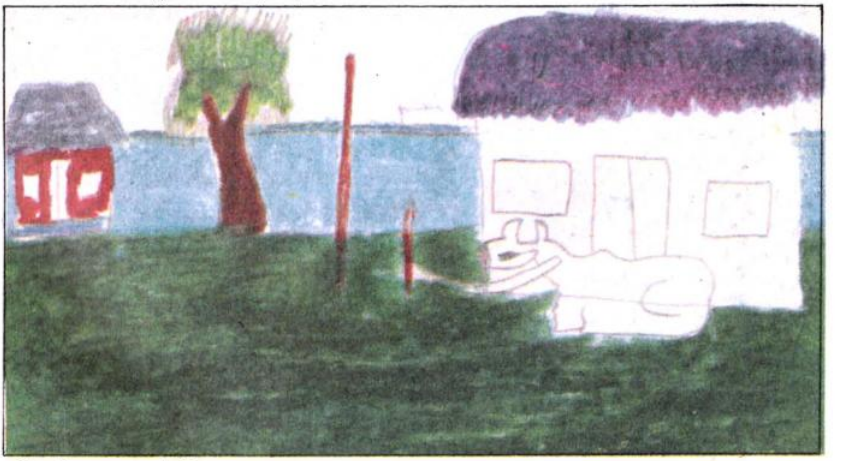

ছবি এঁকেছে কৌশিক সেন (বয়স ৭)

"মা বলতো আমি গালে কি লাগিয়েছি ?"

"ঠিক বলেছ ! বোরোলীন ! তুমি বলো বোরোলীন লাগালে গায়ের চামড়া ভালো থাকে। তাইতো আমি মুখে, হাতে, পায়ে লাগিয়েছি। এবার আমাকে একটা হামু দাও।"

ছোটদের ত্বকের সুরক্ষার জন্য
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

সাধারণ কাটা-ছড়ার জন্য
একটি কার্যকরী অ্যান্টিসেপটিক

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আশা মহল কলকাতা ৭০০০৪৪

HTC-GDP-3760R

পুতুলের বিয়ে

আমার পুতুলের বিয়ে। আমি নিলাম বউ, আমার বন্ধু ঝুমকি নিল বর। মঙ্গলবার পুতুলের বিয়ে হয়ে গেল। সবাইকে নেমন্তন্ন করলাম। লুচি, তরকারি, মিষ্টি, মাংস ইত্যাদি খাবার দেওয়া হল। ঠিক যেন বড়দের বিয়ে।

তারপর বউ বরের বাড়িতে চলে গেল। আমাদের সকলের মন খারাপ হয়ে গেল। কিছুদিন পরে আমার সঙ্গে ঝুমকির খুব ঝগড়া হল। শুনে মা বলল, "তাহলে তোর মেয়েকে আনবি কী করে?" তাই আমি স্কুল থেকে ফেরার পথে ঝুমকির সঙ্গে ভাব করে নিলাম আবার।

ফুল্লশ্রী ঘোষ (বয়স ৯)

দোলায় লাগে

কাতলা মাছের পাতলা ঝোল
খেয়ে হল পেটটি ঢোল
তবলাতে ঐ তাধিন্ বোল্
মাছ এনেছে বিরাট শোল
দোলায় লাগে হাওয়ার দোল
ঐ যে বিরাট হাওড়া-পোল
গেলাস খেল মস্ত টোল্
কেউ কোরো না গণ্ডগোল

মন্দ্রাক্রান্তা সেন (বয়স ৯)

সাহসী গাধা

একটা জঙ্গলে একটা গাধা ছিল। তার খুব সাহস ছিল। সে একদিন একটা বাঘের সঙ্গে লড়াই করল। শেষ পর্যন্ত গাধাই জিতল।

বাঘ বলল, "আমি তোমার বন্ধু।" গাধা খুব খুশি হয়ে বাঘের বাড়িতে থাকতে লাগল। সাপ আর হরিণ বলল, "বাঃ! কী মজা!"

প্রবাল চট্টোপাধ্যায় (বয়স ৭)

সার্কাস

সার্কাস— এই কথাটা শুনলেই আমাদের ছোটদের মধ্যে হৈ-হৈ পড়ে যায়। আর সার্কাস মানেই তো সেই রোমহর্ষক ট্রাপিজ কিংবা ব্যালান্সের খেলা। সেই সঙ্গে অন্যান্য জন্তুর খেলা আর জোকারদের দম-ফাটানো হাসি। এইরকম সার্কাস কে না দেখতে চায়? তাই আমিও গত রবিবার অজন্তা সার্কাস দেখতে গেলাম।

সব সার্কাসের এক-একটা বিশেষ খেলা থাকে। সেইরকম অজন্তা সার্কাসেরও কয়েকটা বিশেষ খেলা আছে। যেমন— শ্যাম হাতির অঙ্ক কষা আর টিয়াপাখির খেলা।

আমরা সন্ধে সাতটায় টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। বিরাট একটা তাঁবুর মধ্যে খেলা হবে। প্রথমে শুরু হল ট্রাপিজের খেলা। তারপর এক-এক করে ব্যালান্স, যোগ-ব্যায়াম, সাইকেল ইত্যাদির খেলা। মাঝেসাঝেই জোকাররা প্রচণ্ড হাসাচ্ছিল। জীপ ও মোটর-সাইকেল জাম্প হল। শ্যাম হাতি অঙ্ক কষল, পুজো করল, টিয়াপাখি কামান দাগল। খোলা জায়গায় বাঘের খেলা দেখাবার পরে শেষ হল সার্কাস।

সুসান চক্রবর্তী (বয়স ১২)

বৃষ্টি পড়ে

বৃষ্টি পড়ে ঝর-ঝর
নদী-পুকুর ভর-ভর
ফুল ফুটেছে থোকা-থোকা
বনে ডাকছে ঝিঁঝি পোকা
জলে জলে একাকার
চলার পথ নেইকো আর

তমালি বসু (বয়স ৮)

টুমটুম

আমার একটি কাকাতুয়া ছিল। তার নাম টুমটুম। সে রোজ ধান খেত। সে আমায় ডাকত নাম ধরে। সে একদিন উড়ে গেল। আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেল।

পৌষালি মুখোপাধ্যায়

গল্পের শেষে

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ভূতের গল্প লিখে রজনীবাবুর বেশ নাম-টাম হয়েছে। ছেলে-বুড়ো সকলেই তাঁর লেখার ভক্ত। কিন্তু তিনি কখনোই কোনো সভা-টভাতে যান না। লোকজনের সঙ্গেও বড়-একটা মেশেন না। কালীঘাটে গঙ্গার কাছাকাছি ফাঁকা জায়গায় তাঁর বাড়ি। তিনি ঘরকুনো, লাজুক; এবং একেবারে মিশুকে নন বলে **অনেকে** তাঁকে ভুতুড়ে লেখক বলে। তাঁর গল্প পড়লে মনে হয়, **প্রায়ই** তিনি প্রেতাত্মাদের দেখা পান। ভক্ত পাঠক-**পাঠিকারা** তাঁকে কতবার চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রশ্ন করেছে, 'আচ্ছা, আপনার গল্প পড়ে মনে হয় অলৌকিক ব্যাপার-ট্যাপার আপনার কাছে জলভাতের মতন। সত্যিই কি এইসব-ব্যাপার ঘটেছিল?' কিন্তু রজনীবাবু চিঠিপত্রে বা ফোনে কিংবা মৌখিকভাবেও এসব প্রশ্নের জবাব দেন না। এক-একটা গল্প লিখে তিনি পাঠককে বিমোহিত করে দেন। এবং কোনো-কোনো পাঠক মনে করে, রজনীবাবুর গল্পের ভেতরেই কখনো-কখনো এইসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়।

সেবার পুজোর সময় রজনীবাবু পুরীতে গিয়েছিলেন। সমুদ্রের ধারে একটা মাঝারি রকমের হোটেলে উঠেছেন। একা একটি ঘর নিয়ে আছেন। দুবেলা সমুদ্রের হাওয়া সেবন করেন, কিন্তু সমুদ্র-স্নানটা রোজ হয়ে ওঠে না। এখানেও দু'চারজন তাঁকে চিনে ফেলে বিরক্ত করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি তাঁর **স্বভাবসিদ্ধ** ঔদাসীন্যে তাদের এড়িয়ে যেতে পেরেছেন। তিনি সমুদ্র দেখেন, মানুষ দেখেন, খবরের কাগজ পড়েন, রেডিওতে খবর শোনেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকে অন্য জায়গায়। সবসময়ই তিনি ভাবেন, লিখতে হবে, আমাকে লিখতে হবে, আমার গল্পের জন্যে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে এক বিশাল পাঠক মণ্ডলী।

সেদিন কালীপুজো। অমাবস্যার রাত। হোটেলের অন্ধকার বারান্দায় চুপ করে বসে তিনি **সমুদ্র** দেখছিলেন। শুধু একনাগাড়ে যে সমুদ্র দেখছিলেন তা নয়। মনে-মনে চেষ্টা করছিলেন একটা গল্প ফাঁদবার। গল্প লেখার সময় শব্দের বাহাদুরি তিনি পছন্দ করেন না। **কৃত্রিম** কোনো ভৌতিক পরিমণ্ডল রচনা করতে ভালবাসেন না। সহজ পরিবেশের ভেতরেই আত্মারা এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেইসব আত্মা অন্তর্ধানের সময় রজনীবাবুর কলমে কমবেশি চমক সৃষ্টি করে যায়।

এমন সময় একটি দশ-এগারো বছরের ছেলে ঠিক রজনীবাবুর পাশে এসে দাঁড়াল। ঘুমের বিছানা ছেড়ে হয়তো বা মা-বাবাকে লুকিয়ে ছেলেটি রাতের সমুদ্র দেখতে এসেছে। **উন্মত্ত ভয়াবহ** সমুদ্র অন্ধকারে যেন গর্জন করছে। সমুদ্র দেখে ছেলেটি হাঁ। রজনীবাবুও ছেলেটিকে দেখে হাঁ। আরে, এ যে তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু নসু। নসু একমনে কিছুক্ষণ

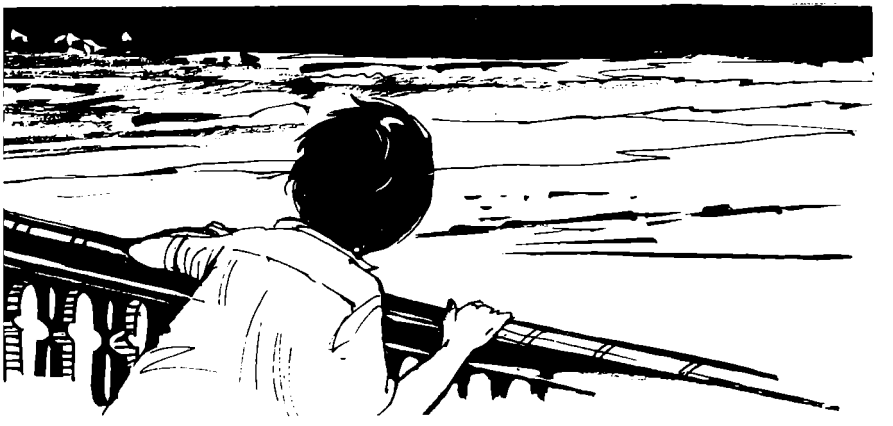

সমুদ্র দেখল। তারপর অন্ধকার বারান্দা দিয়ে সে কোথায় চলে গেল তা বোঝা গেল না।

কিন্তু এটা কেমন করে সম্ভব? আটতিরিশ বছরের মধ্যে নসুর কি আর বয়স বাড়েনি? বছর সাতেক আগে একদিন ডানকুনি স্টেশনে গোকুলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। গোকুলকে তিনি চিনতে পারেননি। মাথায় টাক, হাতে একটা চটের থলি নিয়ে এক ভদ্রলোক রজনীবাবুর সামনে এসে **জিজ্ঞেস** করেছিলেন, "**কীরে** রজনী, আমাকে চিনতে পারছিস না? অমূল্যচরণ বিদ্যায়তনে আমরা একসঙ্গে পড়তাম।" সেদিন গোকুলের সঙ্গে বেশি কথা হয়নি। তবে কিছুদিন আগে **যে** নসু মারা গেছে, সে-খবরটা গোকুলই বলেছিল।

তার মানে এখন থেকে সাত-আট বছর আগে নসু মারা গেছে। কিন্তু এইমাত্র **যে** তিনি স্বচক্ষে নসুকে দেখলেন। হাঁ, সেই নসু। ক্লাস সেভেনের নসু। সেই হাঁ করে চেয়ে থাকা। সেই বড়-বড় চোখ, রোগা **ডিগডিগে** চেহারা। রজনীবাবু চিন্তার খেই হারিয়ে ফেললেন। ভাবতে চেষ্টা করলেন তিনি কী বিষয়ে চিন্তা করছিলেন। তিনি কি সমুদ্রের কথা ভাবছিলেন? নাকি নতুন গল্পের প্লট? রজনীবাবু এই সময় একটা সিগারেট ধরালেন। **আশ্চর্য,** দেশলাইয়ের কাঠি দপ্ করে **জ্বলে** ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল, তিনি নসুর কথাই ভাবছিলেন। আটতিরিশ বছর আগেকার দিনগুলি। নিশি দারোয়ান টিফিনের ঘণ্টা বাজাচ্ছে। নসুর ভাল নামটা বড্ডো খটমটে **বলে** বন্ধুরা তাকে ডাকনামেই ডাকত। কিন্তু শাস্ত্রী-মশাই, সর্বদাই তাকে ডাকতেন, 'ওহে শ্রীমান নৃসিংহ।'

রজনীবাবুর নামডাক ভূতের গল্পের লেখক হিসেবে। প্রেতাত্মার মুখোমুখি হয়ে তিনি যে খুব ভয় পেয়েছেন, এমন **ঘটনা** কখনো ঘটেনি। এখনো তা ঘটল না, কিন্তু তিনি খুব অবাক হলেন। আচমকা এইভাবে নসু দেখা দিল কেন? স্কুলে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল নসু। তাই কি নসু দেখা দিল? বারান্দার আলোটা নিবিয়ে রজনীবাবু ঘরে চলে এলেন।

ঘরের একটি জানলা দিয়ে **সমুদ্র** দেখা যায়। অন্য জানলা দিয়ে **ভেতরের** বারান্দাটা দেখা যায়। রাত্রির **সমুদ্র** **উন্মত্ত**। আজ অমাবস্যা। রজনীবাবু সমুদ্রের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকালেন **অন্ধকার বারান্দার** দিকে। **এমন সময় একটি ছোট ছেলে বারান্দায় এসে** দাঁড়াল। ছেলেটির হাতে **জ্বলন্ত ফুলঝুরি,** বিস্ফারিত চোখে তিনি দেখলেন, ছেলেটি আর কেউ নয়, স্বয়ং নসু। অনেক দূর থেকে কেউ **যেন** কাকে ডাকছে, কে কাকে ডাকছে? তা শোনার মতন অবস্থা তখন তাঁর ছিল না। **তিনি উঠে** জানলা বন্ধ করে চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন। সেই অমূল্যচরণ বিদ্যায়তন। নিশি ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। নসু তাঁর হাত ধরে ডাকছে, 'চল, আমাদের বাড়িতে চল।'

নিউ এম্পায়ারে **হিচককের** ছবি দেখে

হাই পাওয়ার সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে...

এমন.যা নজরে পড়ে!

হাই পাওয়ার সার্ফে আছে বেশী পরিষ্কার করার
ক্ষমতা. যা কাপড়ের ধূলোময়লার প্রতিটি কণা
তুলে বের ক'রে ফেলে। সত্যিকারের ময়লা
জামাকাপড়ও ক'রে তোলে ধবধবে সাদা!
তাই তো. বেশীর ভাগ মায়েরা
কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য
পাউডারের চেয়ে সার্ফই
বেশী ব্যবহার করেন।

বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

লিনটাস-SU-225-1810 BG

রজনীবাবু **ধর্মতলার** দিকে হাঁটছিলেন। ওখান থেকে যদি ট্রামে ওঠা যায়। খেলা ভেঙেছে, তাই খুব ভিড়। আবার গোকুলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হাতে ছাতা, মুখে হাসি আর মাথাজোড়া টাক নিয়ে শ্রীযুক্ত গোকুল। এই বয়সেও তাঁর খেলা দেখার শখ। দুজনেই বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু এখন বাসে ট্রামে ওঠা মানে রীতিমত যুদ্ধ। অবশেষে দুই বন্ধু সিদ্ধান্ত নিলেন আপাতত কোনো চায়ের দোকানে বসে গল্প করা যাক। **ততক্ষণে** ভিড়টাও একটু **ফিকে** হবে। মেট্রো সিনেমার কাছাকাছি একটা **রেস্তোরাঁ**। দোতলায় জানলার ধারে দুই বন্ধু বসলেন। রজনীবাবু গোকুলকে **সিগারেট** অফার করলেন। না, তিনি **ধূমপান** করেন না। গোকুল পকেট থেকে বার করলেন নস্যির ডিবে। চিংড়ি মাছের কাটলেট খেতে-খেতে দুই বন্ধু সেই কবেকার ফেলে-আসা দিনগুলোতে ফিরে গেলেন। হঠাৎ মনে পড়ল পুরীর কথা। সেই আশ্চর্য ঘটনাটা রজনীবাবু যেন কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাই গোকুলকে সমস্ত ঘটনাটা বললেন।

ঘটনাটা শুনে গোকুল কিন্তু একটুও অবাক হলেন না। তার বদলে ছেলেবেলার মতন মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসলেন। তারপর বললেন, একটু গম্ভীর-ভাবেই, "তুমি ভৌতিক কাহিনী-টাহিনী লেখো জানি, তবে এটিকে নিয়ে যেন কাহিনী ফাঁদতে যেও না। পুরীর ঘটনার উপসংহারটা আমাকেই করতে হবে। নইলে সেই তো তুমি আবার পাঠককে বোকা বানাবে।"

গোকুল থামলেন। ইতিমধ্যে কাটলেট শেষ, চা-ও এসে গেছে। চায়ে চুমুক দিয়ে গোকুল আবার বলতে শুরু করলেন, "গতবছর পুজোর সময় নসুর ছেলে ওর মামা-মামির সঙ্গে পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিল। হ্যাঁ, ছেলেটাকে দেখতে **অবিকল ওর বাপের মতন। আমারই মাঝে-মাঝে খটকা লেগে যায়।"**

রজনীবাবু এতখানি বোকা কোনোদিন হননি। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে না কি?"

গোকুল হাসতে-হাসতে মাথা দুলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তা একটু আছে।"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

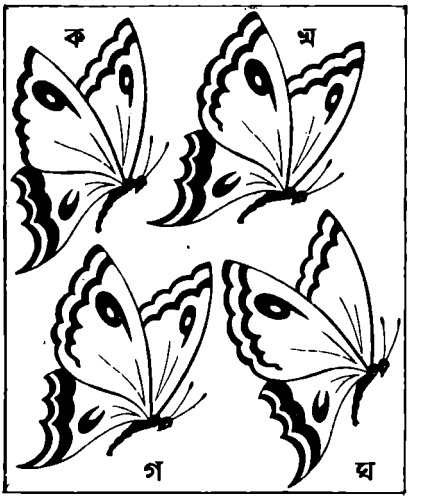

ছবির মজা

চারটে প্রজাপতির মধ্যে কোন্ দুটো হুবহু একই রকম দেখতে, বলতে পারো?

('খ' আর 'গ'-কে দেখতে হুবহু একই রকম।)

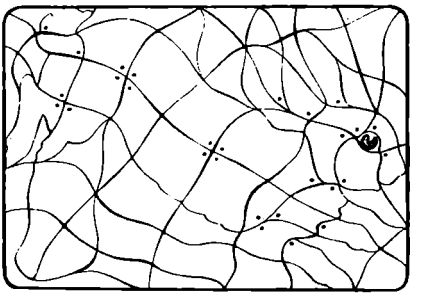

এই ছবির ফুটকি-দেওয়া-খোপগুলো পেনসিল ঘষে ভরাট করলেই নিরীহ আর সুন্দর একটি প্রাণীর চেহারা ফুটে উঠবে।

ব্রিটানিয়া
দুধ বিস্কুট

বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

সুস্বাদু,
পুষ্টিকর

ব্রিটানিয়া
মিল্ক বিকিস

লিনটাস-BBC.MB.3-1812 BG

আগে যা ঘটেছে : শিশিরের অদ্ভুত অসুখ। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি এই পুরনো আঙটি? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। ভুয়ো টেলিগ্রামে পিসিমার অসুখের খবর পেয়ে শিশির হাজারিবাগে আসে। সেখানে আক্রান্ত হয়েও বেঁচে যায়। আলাপ হয় সিংহিবাবুর সঙ্গে। তিনি বলেন, "আমি তোমার শত্রু নই।" প্রয়াগ নামে যে-লোকটি শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত, সে কি কোনও ওষুধ মেশাত তার খাবারে? ভবতোষ সান্যালের বাড়িতে টেলিগ্রামের ফর্ম থাকে কেন? সান্যালের বাসে উঠেছিলেন সিংহিবাবু। দুর্ঘটনায় তিনি আহত। শিশিরকে তিনি জানান, সান্যাল তাদেরই আত্মীয়, কিন্তু প্রতিশোধলিপ্সু। তারপর···

॥ ২৫ ॥

শিশির আর বাবু ধীরে-ধীরে চা খেতে লাগল। এত গরম, ঠোঁট জিভ পুড়ে যাচ্ছে। স্বাদ আহামরি।

সিংহিবাবু বললেন, "ভবতোষের পরিচয় তোমরা শুনলে। তবে একটা কথা সব সময় মনে রেখো, আমি যতটা জানি তোমাদের বললাম। এর বাইরেও থাকতে পারে।

কাছেই রেললাইন, ফটক। একটা ট্রেন আসার শব্দ হচ্ছিল। এই সময় গয়া প্যাসেঞ্জার আসার কথা। বোধ হয় প্যাসেঞ্জার-গাড়িটাই আসছে।

"আমার পরিচয়," সিংহিবাবু বললেন, "দেবার মতন কিছু নয়। আমাদের আদি বাড়ি শ্রীরামপুর। বাবা কলকাতায় একটা স্কুলে পড়াতেন। অঙ্ক আর বিজ্ঞান। বাড়ি শ্রীরামপুরে হলেও কলকাতাতেই আমরা থাকতাম। অখিল মিস্ত্রি লেনে। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। বাবা মারা যাবার পর আমার মামা আমাদের কাশীতে নিয়ে গেলেন। মামা কাশীতেই থাকতেন। সেখানেই আমার ছেলেবেলার অর্ধেক কেটেছে, মানে কলকাতা ছাড়ার পর থেকে বকিটা। ওখানেই বড় হয়েছি। ওই মাঝে-মাঝে হয়তো মির্জাপুর, এলাহাবাদে গিয়ে থেকেছি। তা আমার মামার দু রকম কাজকর্ম ছিল। একটা বড় বাঙালি হোটেলে তিনি ম্যানেজারি করতেন। মালিক মারা যাবার পর তাঁর স্ত্রী মামার হাতেই সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। হোটেলের কাজটা ছিল মামার চাকরি। আর অন্যদিকে মামার ছিল নানা রকম টোটকা ওষুধপত্র তৈরি করার বাই। তিনি কিন্তু কবিরাজ ছিলেন না। কাশীর এক বিখ্যাত কবিরাজ তুলসীচরণ সেনশর্মা মামাকে ছেলের মতন ভালবাসতেন। মামা সেখানে কিছু কিছু কবিরাজি শিখেছিলেন। আমাকে মামা কবিরাজ তুলসীচরণের কাছে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র শিখতে লাগিয়ে দেন। আমার কপাল খারাপ, আট মাসও শিখলাম না। তুলসীচরণ দেহ রাখলেন। বছর-চার পরে মামাও মারা গেলেন। বাড়িতে অনেক পোষ্য। আমার মামাতো ভাই মামার হোটেলের ম্যানেজারগিরির চাকরিটা নিল। আর আমি গোধুলিয়ার কাছে একটা দোকান খুলে বসলাম। ওই কাশীতেই আমার সঙ্গে ভবতোষের প্রথম পরিচয়।"

সিংহিবাবু থামলেন। যন্ত্রণা হচ্ছিল হাতে। কষ্টের শব্দ করলেন। রাস্তা দিয়ে কারা যেন চলে যাচ্ছিল। এখানকার লোকজন। কাজকর্ম সেরে যে যার মতন বাজার করে ফিরছে। গামছায় বাঁধা পুঁটলি, হাতে ঝোলানো।

বাবু চা নামিয়ে রাখল। অর্ধেকের বেশি খেয়েছে। আর খেতে পারছিল না।

শিশির বলল,"হালে পরিচয়, না আগে?'

সিংহিবাবু বললেন, "না না, হালে নয়। বললাম যে, আমি যখন কাশীতে কবিরাজি আর টোটকার ওষুধ বেচতাম, তখন আলাপ। কেমন করে আলাপ ঘটল, বলি। মামা মারা যাবার পর হোটেলের ম্যানেজারগিরির কাজটা নিয়েছিল আমার মামাতো ভাই—তা তো বলেছি তোমাদের। সেই হোটেলে ভবতোষ এসে

উঠেছিল ওর স্ত্রীকে নিয়ে। একদিন দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে ভবতোষের চোট লাগে। কানের দিকে এমন একটা চাপা জখম হল যে, যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছিল। মাথা তোলার সাধ্য হচ্ছিল না। আরও উপসর্গ ছিল নানা রকম। ডাক্তাররা ওষুধপত্র দিয়ে কিছুই করতে পারছিল না। আমার ভাই আমাকে ধরে নিয়ে যায় তার হোটেলে। আমি ওষুধ দিয়ে দিন দুয়েকের মধ্যে ভবতোষকে আরাম করে তুলি। সেই আলাপ।"

"কী হয়েছিল ওঁর?"

"তা আমি জানি না। স্নায়ুতে কিছু হয়েছিল। স্নায়ুর জখম।"

"আপনি আন্দাজে ওষুধ দিলেন?"

"হ্যাঁ। তোমাদের ডাক্তারিও চোদ্দ আনা ওষুধ দেয় আন্দাজে।...তুমি নিজেই জানো তোমার অসুখে কত আন্দাজি ওষুধ খেয়েছ।"

শিশির আর অবাক হল না। সিংহিবাবুর কাছে সত্যিই তার কিছু গোপন নেই।

বাবু বলল, "সেই আলাপের পর কী হল বলুন?"

সিংহিবাবু বললেন, "আলাপের পর ভবতোষ আমার দোকানে দু-তিনবার এসেছে। আমাকে হোটেলে যেতে হয়েছে। গল্পগুজব করেছি দুজনে। ...ভবতোষ ভেতরে যেমনই হোক, বাইরে সদালাপী। চট্ করে মানুষকে বশ করতে পারে।"

বাবু যেন ঠাট্টা করেই বলল, "আপনাকেও বশ করেছিল!"

"হ্যাঁ। আমি বশ হয়েছিলাম। ...তা সে-কথা থাক। ভবতোষ কলকাতায় ফিরে গেল। আমার সঙ্গে দু-চারটে চিঠি-চাপাটি চলত। বছর খানেকের মধ্যে আমাদের সংসারে আবার একটা ঝড় এল। মা মারা গেল। বোন গেল। অবশ্য তার শ্বশুর-বাড়িতে। ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল। মামাদের বাড়িতেও সেই অবস্থা। সব তছনছ হয়ে গেল। আমি কাশী ছেড়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে-ঘুরতে গিয়ে পড়লাম কলকাতায়। ভবতোষের সঙ্গে দেখা করলাম।"

সিংহিবাবু আবার থামলেন। পুরনো কথা ভাবছিলেন বোধ হয়।

বাবু একটা সিগারেট খাবার জন্যে উশখুশ করছিল। কেমন ইতস্তত করে বলল, "আমি একটা সিগারেট খাব?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় খাবে। খাও।" সিংহিবাবু বললেন।

"আপনি খান সিগারেট?"

"না। আগে খেতাম। ...তা দাও একটা, খাই।"

বাবু উঠে গিয়ে সিংহিবাবুকে সিগারেট দিল। ধরিয়ে দিল দেশলাই জ্বেলে। তারপর নিজে সিগারেট ধরাল।

সিংহিবাবু সিগারেটে টান দিলেন ধীরে। বললেন, "মানুষ এক-একটা এমন ভুল করে যে, তার আর চারা থাকে না। আমারও সেই ভুল হল। ভবতোষকে আমি বলেছিলাম, টাকাপয়সা পেলে আমি একটা ওষুধের কারবার খুলতে পারি। তবে কলকাতায় নয়, কাশীতেও নয়, গোরখপুরে। কেন বলেছিলাম—তার কারণ আছে। কবিরাজি, টোটকা—এই সব ওষুধ বড়লোকদের জন্যে নয়, তারা বিশ্বাসও করে না। যারা গরিব, যাদের বিশ্বাস আছে গাছগাছড়ায়, তারা আমাদের কাছে আসে। ইউ পি-র দিকে গাঁ-গ্রামের মানুষ আজও আয়ুর্বেদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ...আমার কথা শুনে ভবতোষ আমায় টাকা দিতে রাজি হল।"

"বুঝেছি," শিশির বলল, "আপনি ভবতোষের টাকা নিয়ে তার খপ্পরে গিয়ে পড়েন।"

"হ্যাঁ; কথাটা এক রকম তাই," সিংহিবাবু বললেন। "টাকা ভবতোষ আমায় দিয়েছিল। আমি নিয়েছিলাম। গোরখপুরে গিয়ে আমি ওষুধের একটা ব্যবসাও শুরু করি। মোটামুটি ভালই চলছিল ব্যবসা। কিন্তু আবার আমার কপাল ভাঙল। আচমকা গোরখপুরে দেখা দিল প্লেগ। একেবারে মহামারী হয়ে। সবাই প্রাণের ভয়ে পালাতে লাগল। আমিও পালিয়ে গেলাম কাশীতে। আর তখনই আমি এমন একটা ওষুধ বরাতজোরে পেয়ে গেলাম, যা মানুষকে উন্মাদ-রোগ থেকে বাঁচাতে পারে। না না, কোনো রোগেরই যেমন শেষ ওষুধ হয় না, এরও তাই। নানা ধরনের উন্মাদ-ব্যাধি এই ওষুধে সারে, আবার অনেক উন্মাদ-রোগ সারে না। এই ওষুধের কথা ভবতোষকে আমি জানালাম। আবার অর্থসাহায্য চাইলাম।"

"এবারও সাহায্য পেলেন?"

"হ্যাঁ। কিন্তু একটা কথা এখানে বলে রাখি। আমি যে-ওষুধের কথা বলছি, তাতে যেমন উন্মাদ-রোগ সারার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি

আবার এই ওষুধ তৈরির সময়, কমপোজিশানের হেরফের ঘটালে মানুষকে উন্মাদ করে তোলা যায়।"

শিশির কেমন চমকে উঠল। সন্দিগ্ধ হল। "আপনি কি এই কথাটাও ভবতোষকে জানিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর?"

"তারপর একদিন ভবতোষ লোক দিয়ে আমায় ডেকে পাঠাল হঠাৎ।"

"কলকাতায়?"

"না, এখানে।"

"এখানে কেন?"

"ভবতোষ তখন এখানেই থাকতে শুরু করেছিল। কলকাতায় তেমন যেত না কাজেকর্মে ছাড়া।"

"আপনাকে ডাকার কারণ?"

"তুমি।"

"আমি?" শিশির যেন আঁতকে উঠল।

সিংহিবাবু সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিলেন। বললেন, "হ্যাঁ, তুমি। ...তুমি তোমার পিসিমার বাড়ি এসেছিলে বেড়াতে। ভবতোষ তোমাদের অনেক খবরই রাখত, কিন্তু এটা জানত না যে, তোমার পিসিমা-পিসেমশাই এখানে থাকেন। একদিন সে তোমাদের বাজারে দেখতে পেয়ে যায়। তোমায় সে দেখেছে। কলকাতার বাড়িতে। খোঁজখবর করে ভবতোষ বুঝল, তুমি তার চিরশত্রুর ছেলে।"

শিশির যেন বাকিটা বুঝে ফেলল। "আমি ক'মাস আগে এখানে এসেছিলাম। তখন ভবতোষ আমায় দেখেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমি এখানে থাকতে-থাকতেই আপনাকে আনান?"

"হ্যাঁ, লোক পাঠিয়ে ধরে আনান।"

"উদ্দেশ্য?"

"তোমায় কষ্ট দেওয়া, ভোলানো, প্রায় উন্মাদ করে তোলা।"

শিশির কেমন ঘৃণার চোখে সিংহিবাবুর দিকে তাকাল। লোকটা মানুষ না পশু?

বাবু বলল, "আপনাকে কাজে লাগিয়েছেন ভবতোষ?"

"হ্যাঁ, লাগিয়েছে।"

"আপনার স্বার্থ কী?"

সিংহিবাবু চুপ। অনেকক্ষণ পরে বললেন, "অর্থ। ভবতোষ আমার কাছে হাজার-পনেরো টাকা পেত। ঋণ। আমি শোধ করতে পারিনি। ...আমাদের শর্ত ছিল, ভবতোষের কথামতন কাজ করলে আমায় আরও পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া হবে।"

"তার মানে—আমায় পাগল করতে পারলে আপনি পঁচিশ হাজার টাকা আরও পাবেন?" শিশির ঘৃণায়, রাগে যেন কাঁপছিল।

সিংহিবাবু বললেন, "শর্ত সেই রকম ছিল। কিন্তু আমি তোমায় পাগল করিনি। আমার ওষুধের কিছু হেরফের করেছিলাম।"

"কেন?"

"তুমি নিজেই ভেবে দেখো, কেন!"

(ক্রমশ)

ছবি : সুনীল শীল

মতি নন্দী
এবং
খেলার পৃথিবী

মতি নন্দী এমন এক জগৎ নিয়ে লিখেছেন কয়েকটি অসামান্য উপন্যাস, যে-জগতের মাত্র একটা দিকই আমরা জানতাম এতকাল। খেলার মাঠ আর খেলোয়াড়দের নিয়ে লেখা তাঁর উপন্যাসগুলিতে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সম্পূর্ণ অদেখা এক জগৎ। ক্রিকেট নিয়ে 'ননীদা নট আউট', ফুটবল নিয়ে 'স্ট্রাইকার' ও 'স্টপার', সাঁতার নিয়ে 'কোনি' এবং ক্রিকেট ও টেনিস নিয়ে লেখা নতুন বই 'অপরাজিত আনন্দ' এমন-সব নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে দেয় আমাদের যে, সম্পূর্ণ নতুন চোখে দেখতে শিখি আমরা খেলার জগৎকে তথা মানুষের জীবনকে।

আরো অনেক বই

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকম্পের পটভূমি ৫·০০ আশা দেবীর আসল টেনিদা ১০·০০ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের রুকুসুকু ৮·০০ ইন্দ্র মিত্রের বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৬·০০ শরৎ-কথামালা ১০·০০ দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথায় কথায় ১০·০০ সুজিতকুমার সেনগুপ্তের রহস্যময় সেই রিভলবার ৬·০০ সুনির্মল বসুর ছন্দের টুংটাং ৮·০০ বঙ্কিমচন্দ্র ৪·০০ মাইকেল মধুসূদন ৬·০০ পার্থসারথি চক্রবর্তীর কেমিক্যাল ম্যাজিক ৫·০০ চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৫·০০ রসায়নের ভেলকি ৪·০০ ম্যাজিকের মত মজা ৫·০০ তত সহজ ছিল না ৫·০০মজার এক্সপেরিমেন্ট ৫·০০ বুদ্ধি নিয়ে দারুণ মজা ৬·০০ পদার্থবিজ্ঞানের খোশখবর ৭·০০।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

॥ ৩৮ ॥

এলগিন রোডের বাড়ি থেকে সরে গিয়ে অন্য কোথাও থেকে অন্তর্ধানের পরিকল্পনা দুভাবে করা যেত। রাঙাকাকাবাবুই এই দুই সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। প্রথমটা ছিল উডবার্ন পার্কের বাড়িতে চলে যাওয়া। দ্বিতীয়টা ছিল রিষড়ায় বাবার বাগানবাড়ি থেকে অন্তর্ধানের ব্যবস্থা করা। রাঙাকাকাবাবু বললেন যে তিনি অনশন করে মুক্তি পেয়েছেন, সুতরাং ওঁর স্বাস্থ্য যে ভাল নয় সেটা সকলেরই জানা। ডাঃ মণি দে-র ডাক্তারি বুলেটিনও খবরের কাগজে বেরিয়েছে, তাতেও তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের উল্লেখ আছে। প্রচার করে দেওয়া যাক যে, এলগিন রোডের বাড়িতে তিনি একটা ঘরে বন্দী হয়ে আছেন, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য যথেষ্ট আলো-হাওয়া ও বেড়াবার সুযোগ পাচ্ছেন না। সেজন্য তিনি উডবার্ন পার্কের বাড়ির তিনতলার একটা ঘরে থাকবেন। পাশেই বড় ছাদ, খুব আলো-বাতাস পাবেন, আর বেড়াতেও পারবেন। রিষড়ার বাড়িতে গেলে তো কথাই নেই। সেখানে তো গঙ্গার উপর বাবার একটা সুন্দর বাগানবাড়ি আছে। অসুস্থ লোকের পক্ষে চমৎকার জায়গা।

আমাকে রাঙাকাকাবাবু বললেন, উডবার্ন পার্কের বাড়ি থেকে সব ব্যবস্থা করতে তো আমার সুবিধাই হওয়া উচিত। রিষড়ার বাড়িতে সাধারণত একটি লোকই থাকে, তাকে কীভাবে আয়ত্তে আনা যায় সেটা ভেবে দেখতে হবে।

আমি ভাল করে ভেবে দেখলাম। মনে হল রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে দিনকতক খোলাখুলি ভাবে কথাবার্তা বলে আমার বুদ্ধিটা যেন একটু খুলেছে। আমি স্থির সিদ্ধান্তে এলাম যে, প্রথম পর্যায়ে অন্য কোথাও চলে গিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তর্ধানের পরিকল্পনা মোটেই সুবিধার হবে না। আমি সোজাসুজি রাঙাকাকাবাবুকে বললাম, সকলেই জানে যে আপনি বেশ অসুস্থ, এই একটি ঘরে থাকেন, এমনকী বারান্দায়ও বেরোন না। বিশেষ করে যে-সব পুলিশের চর আপনার গতিবিধির উপর নজর রাখে এবং বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, তাদেরও ঐ একই ধারণা। ওদের আচরণ লক্ষ করে আমারও মনে হয়েছে যে, তাদের মধ্যে একটা আত্মসন্তুষ্টির ভাব এসেছে এবং মনে হয় ওরা কাজে একটু ঢিলে দিয়েছে। এই অবস্থায় রাঙাকাকাবাবু যদি সকলকে জানিয়ে অন্য বাড়িতে চলে যান তাহলে সবাই আবার সজাগ ও সতর্ক হয়ে যাবে। পুলিশের দিক থেকে আবার নতুন ব্যবস্থা হবে, ফলে আমাদের অসুবিধাই হবে। তাছাড়া উডবার্ন পার্কের বাড়িতে শৃঙ্খলাটা বেশ কড়া, যে-সব লোকজন বাড়িতে থাকে ও কাজ করে, বিশেষ করে নীচের তলার বেয়ারা, গেটের দরওয়ান ও দুই ড্রাইভার, তারা সকলেই খুবই বিশ্বস্ত ও সতর্ক, সন্দেহজনক গতিবিধি দেখলেই শোরগোল তুলবে। রিষড়ার বাড়িতে অবশ্য লোকজন কম, কিন্তু আমার বিশ্বাস কলকাতার বাইরে রাঙাকাকাবাবু কোথাও গেলেই পুলিশ সেখানে নতুন করে অনেক লোক বসাবে। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, উডবার্ন পার্কের বা রিষড়ার বাড়ি ব্যবহার না করাই ভাল। বলেই মনে হল বোধহয় মাত্রা ছাড়িয়ে গেছি, এতটা মাস্টারি না করলেও হত। কিন্তু রাঙাকাকাবাবু বলে উঠলেন, ঠিক বলেছ, ও-পথে যাওয়া চলবে না। কিছু অসুবিধা থাকলেও এ-বাড়ি থেকেই যাত্রা করার প্ল্যান করতে হবে।

একদিন একটু বেশি কাছে ডেকে রাঙাকাকাবাবু একটা খুব শক্ত প্রশ্ন করলেন, বাবা-মাকে না জানিয়ে কাজটা করতে পারবে? আমি সোজাসুজি উত্তর দিলাম না। স্থির হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে অস্পষ্টভাবে বললাম, ঠিক আছে।

Eamon de Valéra

ডি ভ্যালেরা (লেখকের তোলা ফোটো)

রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আলোচনা যখন খুব জোর কদমে চলছে, আমার মনে হল অন্য কয়েকটা ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের কাহিনী খুঁটিয়ে দেখে নিলে হয়, কিছু আইডিয়া পাওয়া যেতে পারে। শিবাজির ব্যাপারটা বড়ই পুরনো, বর্তমান যুগের গাড়ি বা অন্যান্য যানবাহন ব্যবহার তো সেখানে নেই। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-যুদ্ধের এক প্রধান হোতা ডি ভ্যালেরার ইংল্যাণ্ডের লিঙ্কন জেল থেকে পালানোর কাহিনীটা মনে ধরল। যদিও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভেদ দুই ক্ষেত্রে যথেষ্ট, আমাদের প্রতিপক্ষ তো একই। ভাগ্যিস ডি ভ্যালেরার জেল থেকে অদৃশ্য হবার ব্যাপারটা পড়ে নিয়েছিলাম। ১৭ই জানুয়ারি রাতে গাড়িতে রাঙাকাকাবাবু ডি ভ্যালেরার এস্‌কেপ সম্বন্ধে জানি কিনা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ১৯১৯ সালে ডি ভ্যালেরা—যাঁকে তাঁর সংগ্রামসঙ্গীরা 'ডেভ' বলে ডাকতেন—যে-জেলে বন্দী ছিলেন তার পিছনের দিক দিয়ে একটা ছোট দরজা ছিল। জেলের পাদ্রিসাহেব সেই দরজা দিয়ে যাতায়াত করতেন এবং দরজার চাবিটি তিনি প্রায়ই এদিক-ওদিক ফেলে রাখতেন। ডি ভ্যালেরা মোমবাতির মোম গালিয়ে চাবিটির একটি ছাপ নিয়ে নিলেন। ছাপটির সাহায্যে একটি ক্রিসমাস কার্ডে চাবির একটা নকশা এঁকে 'ডেভ'-এর এক সাথী কৌতুকের ছলে কয়েকটি ইঙ্গিতপূর্ণ কথা লিখে বাইরে বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বাইরে থেকে চাবি তৈরি করে কেকের মধ্যে লুকিয়ে জেলে পাঠানো হল। বার-দুয়েক তো চাবি ঠিক হল না। তৃতীয় বার বাইরে থেকে পাঠানো চাবিটি জেলের মধ্যে এক বন্দী ঘষে-মেজে ঠিক করলেন। ডি ভ্যালেরাকে নিয়ে যাবার জন্য জেলের পিছনের জঙ্গলে যাঁরা লুকিয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তিযুদ্ধের প্রবাদপুরুষ আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির নায়ক মাইকেল কলিনস। সিগন্যাল আদান-প্রদানের পর ডি ভ্যালেরা তো ঠিকমতো ভিতরের দরজাটা খুললেন, এবং বাইরে থেকে তাঁকে দেখা গেল। বাইরের লোহার দরজায় চাবি লাগিয়ে মাইকেল কলিনস চাড় দিতেই কলের ভিতরে চাবিটি গেল ভেঙে। কলিনস মুষড়ে পড়ে বলে উঠলেন, "আই হ্যাভ ব্রোকেন এ কী ইন দি লক, ডেভ।" চমকে উঠে ডি ভ্যালেরা তাঁর হাতের চাবিটি দিয়ে ভিতরের দিক থেকে একটু ঠেলা দিতেই ভাগ্যের জোরে ভাঙা চাবিটি পড়ে গেল। লিঙ্কন শহর পর্যন্ত সকলে হাঁটলেন। পথে কিছু সিপাই-সান্ত্রী ছিল, যেমন আমরাও গাড়ি থেকে পথে কিছু দেখেছিলাম। তাদের সম্ভাষণ করতে করতে তাঁরা এগোলেন। অন্ধকার রাতে মুক্ত বন্দীদের নিয়ে তীরবেগে একটা ট্যাক্সি উধাও হয়ে গেল।

ডি ভ্যালেরার কাহিনী পড়ে আমি একটু চিন্তিতই হয়ে পড়লাম। তাঁর জেল থেকে পালাবার ব্যবস্থাদি করেছিলেন অভিজ্ঞ বিপ্লবীরা। তাও কত রকমের অসুবিধা হয়েছিল। আমি ভাবলাম, আমার মতো ছেলে-ছোকরা দিয়ে কি রাঙাকাকাবাবু এত শক্ত কাজ সামাল দিতে পারবেন! কোথায় মাইকেল কলিনস আর কোথায় আমি! দায়িত্বটা যে কত বড় সেটাই বোঝার ক্ষমতা আছে কিনা কে জানে? যাই হোক, নিজেকে বোঝালাম, যথাসাধ্য করতে হবে।

১৯৪৮ সালের শেষের দিকে বাবা-মা ও দুই বোনের সঙ্গে ডাবলিনে গিয়েছি। আমার মনের মধ্যে কৌতূহল ও চাপা উত্তেজনা ছাপিয়ে উঠছে। সেখানে দেখতে পাব সেই ডি ভ্যালেরাকে। হয়তো কিছু কথাবার্তা বলারও সুযোগ হবে। ডাবলিনের 'ডয়েল' বা পার্লামেণ্ট ভবনে ডি ভ্যালেরা বাবাকে অভ্যর্থনা করলেন। বাবার সঙ্গে তাঁর অনেক কথা হল। তিরিশের দশকে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে ডি ভ্যালেরার কয়েকবারই দেখা হয়েছে। দুই মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে খুবই সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বাবা সপরিবারে তাঁর কাছে যাতায়াতে বসুবাড়ির সঙ্গে ডি ভ্যালেরার সম্পর্কটা আরও গভীর হল। আমি তাঁকে বললাম, "১৯৪৩-এ বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় আপনি আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে রেড ক্রস মারফত যে-সাহায্য পাঠিয়েছিলেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রাঙাকাকাবাবু আপনাকে উদ্দেশ করে একটা বেতার-ভাষণ দিয়েছিলেন।" শুনে ডি ভ্যালেরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, "সুভাষের ঐ ভাষণটি যোগাড় করে অতিঅবশ্য আমাকে পাঠিয়ে দেবে।" সঙ্গে ক্যামেরা ছিল। আলো কম, তবু বেশ কয়েকটি ছবি তুললাম। পরে লণ্ডন থেকে ছবি তৈরি করে তাঁকে পাঠাই এবং একটি ছবি সই করে আমাকে ফেরত দিতে অনুরোধ করি। ডি ভ্যালেরা কালক্ষেপ না করে সানন্দ সম্ভাষণ জানিয়ে আমার অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

১৯৪০-এ বাবার শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। রাঙাকাকাবাবু মুক্তি পাবার কিছুদিন পরেই বাবা স্বাস্থ্যের জন্য কালিম্পঙে চলে গেলেন, আইন-ব্যবসায়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য সুধীরঞ্জন দাসের অতিথি হয়ে। মনে আছে, দু-তিনবার রাঙাকাকাবাবু বাবার কাছে চিঠি লিখে সরাসরি শেয়ালদা স্টেশনে দার্জিলিং মেলে পৌঁছে দিয়েছেন যাতে মাঝপথে কোনো ডাকঘরে পুলিশের লোক সেগুলি খুলে না দেখে। আর কিছুদিন পরে বড়দিনের ছুটিতে বাড়ির আর-সকলকে নিয়ে মা আমার বড় দাদার কাছে ধানবাদ অঞ্চলে বারারি চলে গেলেন। ফলে যখন আমি রাঙাকাকাবাবুর গোপন-যাত্রার জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ করলাম তখন উডবার্ন পার্কের বাড়ি খালি।

(ক্রমশ)

বেঁটে বটুকের বেটি

শিবশম্ভু পাল

বেঁটে বটুকের বেটি কিনেছিল
দু'টি মোটে বাটা মৎস্য
বঁটি দিয়ে কেটে উনুনে চড়াতে
গন্ধ ওঠে বীভৎস।
বটুকের বেটি বাটিচচ্চড়ি
খাবে বলে ভেবেছিল
বাটামাছ দুটো বটে এত বাজে
ভাবেনিকো একতিলও।
বাটামাছ কিনে কাটা গেল মাথা,
কাটাপোনা হলে সেটি
ক'টা টাকা বেশি লাগলেও বেশ,
ভাবে বটুকের বেটি।

বটুকের বেটি বটতলা গেল,
কাটাপোনা কিনে আনে
বাটনাটাটনা বাটাবাটি করে
রান্না চড়িয়ে স্নানে
যেই গেল চলে, বেঁটে বটুকের
জিভ ভরে জলে, আহা,
বাটামাছ দু'টো বোকা বেটি তার
ঠকে গিয়েছিল ডাহা।
স্নান সেরে এলে লাঠি ঠুকে বলে
বটুকচন্দ্র, 'বৎস,
টাকাটাই মোটে বড় নয়,
তুই আনবি টাটকা মৎস্য।'

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

পৃথিবীর জন্মদিন

সন্ধ্যা দত্ত

বিলটুর জন্মদিনে দুপুরবেলাটা ভালই কেটেছে। পায়েসটা যা দারুণ হয়েছিল না! এখন সন্ধেবেলা, টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। বাইরে বেরোবার উপায় নেই। অগত্যা বারান্দায় তক্তপোশের ওপর তিন ভাইবোনে দাদুকে ঘিরে বসল। —নতুন কোনো গল্প শোনার আশায়। বিলটুর ছোটভাই পিণ্টু দাদুকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা দাদু, তুমি তো কোনোদিন পায়েস খাও না—তাহলে তোমার জন্মদিনে কী খেতে তুমি?"

বিলটু বিজ্ঞের মতো বলল, "কেন? যারা পায়েস খায় না, মিষ্টির বদলে তাদের আচার দেওয়া হত, সে তো আরো মজার ব্যাপার! ইস্, আমার তো জিবে জল এসে যাচ্ছে।"

দিদি মিণ্টু ভাইদের জ্ঞানের বহর দেখে হেসেই অস্থির। দাদু কেন মিষ্টি খান না, সে-সম্বন্ধে বড়দের কাছ থেকে তার কিছুটা জানা আছে। সে বলে উঠল, "দূর বোকা! দাদুর ডায়গেটিভ হয়েছে না!"

দাদু হেসে বললেন, "দিদিভাই, একটু ভুল হল যে—রোগটার নাম 'ডায়াবেটিস', ডায়েগেটিভ নয়। তবে আজ বিলটু-দাদাভাইয়ের জন্মদিনের আনন্দের মাঝখানে রোগভোগের কথা থাক। তোমাদের আসল মতলব তো গল্প-শোনা—তাই না?"

ওরা প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ!"

দাদু বললেন, "তাহলে আজ তোমাদের একটা জন্মদিনের গল্প শোনাই।"

পিণ্টু খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার ছোটবেলাকার জন্মদিনের গল্প তো?"

দাদু হাসলেন, "না, আমাদের সময় জন্মদিন-টিন ছিল না। আমরা যে-পৃথিবীতে বাস করি তারও তো একটা জন্মদিন আছে—সেই গল্পই বলব।"

"সে তো শুনেছি ভূগোলের ব্যাপার। ও-সব শুনতে ইচ্ছে করছে না আজ।" মিণ্টুর মুখখানা ব্যাজার-ব্যাজার।

দাদু অভয় দিলেন, "পৃথিবীর জন্ম নিয়ে ভূগোলের গল্পও যেমন আছে, তেমনি আমাদের পুরাণেও একটা মজার গল্প রয়েছে। আমি পুরাণের গল্পটাই শোনাব তোমাদের।"

ওরা সোজা হয়ে বসল। দাদু শুরু করলেন, "আমাদের শাস্ত্রে বলে ব্রহ্মা পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি দিনে সৃষ্টি করেন, আর তাঁর যখন রাত্রি তখন শুরু হয় মহাপ্রলয়—"

বিলটু প্রশ্ন করে, "প্রলয় কী দাদু?"

"ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো যখন একসঙ্গে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে ও বেশ কিছুদিন ধরে পৃথিবীতে দাপাদাপি করতে থাকে—তখন তাকে প্রলয় বলে।"

দাদুর উত্তর শুনে ছোট্ট পিন্টু তো ভয়ে জড়সড় হয়ে একেবারে দাদুর কোলে চড়ে বসল। "সকাল থেকে যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, এখন আবার হাওয়াও বইছে বেশ জোরে, আবার প্রলয় শুরু হবে না তো দাদু?"

মিন্টু ধমক দিয়ে উঠল, "তুই একটা ভিতুর ডিম। যা ভেতরে গিয়ে মার কোলে ঘুমো গিয়ে। তোকে আর পৃথিবীর জন্মদিনের গপ্‌পো শুনতে হবে না।"

দাদু ব্যাপারটা মিটমাট করিয়ে আবার শুরু করেন, "এই রকম এক প্রলয়ের সময় পৃথিবী এক বিরাট কারণ-সমুদ্রে পরিণত হয়। চতুর্দিকে জল আর জল—কোথাও এতটুকু স্থলভাগ দেখা যায় না। তখন বিষ্ণু নামে আর-একজন দেবতার ভীষণ ঘুম পেল। ঘুমের জন্য তিনি কোনো জায়গাই খুঁজে পাচ্ছেন না। অগত্যা অনন্তনাগ নামে এক বিরাট সর্পরাজকে বিছানা করে তিনি যোগনিদ্রায় নিমগ্ন হলেন।"

সাপের ওপর ঘুমোনো শুনে পিন্টু তো ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। বিলটুর বুকটাও একটু দুরু দুরু করতে লাগল। কিন্তু সে সামলে নিয়ে একটা বড় রকমের ঢোক গিলে চুপ করে রইল। দুই ভাইয়ের অবস্থা দেখে মিন্টু কিন্তু মনের কথা একটুও প্রকাশ না করে শুকনো ঠোঁট দুটো একটু ভিজিয়ে নিয়ে বলল, "বাব্বা! দেবতা বলেই সাপের ওপর শুতে পেরেছিলেন। তাই না দাদু? কিন্তু যোগনিদ্রা কী জিনিস?"

দাদু বলেন, "দেবদেবীরা তো আমাদের মতো ঘুমোন না? তাঁদের নিদ্রাকালে অপার্থিব, স্বর্গীয় কিছু যোগ হয় বলে তাঁদের নিদ্রাকে যোগনিদ্রা বলে।"

বিলটুর প্রশ্ন—"তারপর কী হল দাদু? সাপটা আবার বিষ্ণুকে মেরে ফেলেনি তো?"

দাদু বলেন, "মেরে ফেলবে কী? বিষ্ণু তো অমর। অনন্তনাগ বিষ্ণুর বিছানা হয়েই রইল। এদিকে হল কি—মধু ও কৈটভ নামে দুই ভয়ঙ্কর অসুর বেরিয়ে এল বিষ্ণুর কান থেকে।"

অসুরের নাম শুনে পিন্টু বলে উঠল, "দাদু, এসব সাপ অসুরের গল্প বাদ দিয়ে একটা রাজা-রানীর গল্প বলো-না।"

বিলটু এক ধমক লাগায়, "তাহলে মার কোলে বসে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাও গে যাও। আর কোনো কিছু জানতে চেয়ো না!"

দাদু পিন্টুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, "ঠিকই তো! নতুন কিছু জানতে হলে ধৈর্য ধরে সব-কিছু শুনতে হবে তো? ভয় পেলে চলবে কেন দাদাভাই।"

বিলটু বলে, "তুমি থেমো না দাদু, বলে যাও।"

দাদু বলতে থাকেন, "মধু ও কৈটভ তখন সেই মহাসমুদ্রে এদিক-ওদিক বিচরণ করতে

লাগল, আর দুজনে বলাবলি করতে লাগল—এই বিশাল সমুদ্র কে সৃষ্টি করল, বল্ তো ভাই? মধু বলল—আমার মনে হয় নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো দৈবশক্তি আছে। কৈটভ বলল —ঠিক বলেছিস, আমারও তাই মনে হয়। আয় আমরা দুজনে সেই দেবতার স্তব করি। এই বলে দুজনে তখন স্তব আরম্ভ করল। এভাবে দীর্ঘকাল আরাধনা করার পর দেবী তুষ্ট হয়ে তাদের বর দিতে চাইলেন। মধু-কৈটভ তখন খুশি হয়ে স্বেচ্ছামৃত্যুবর প্রার্থনা করল। দেবী বললেন, তাই হবে। বর পেয়ে তারা তো খুব খুশি। দিব্যি আনন্দে জলের মধ্যে জলজন্তুদের সঙ্গে খেলা করতে লাগল।

"কিছুদিন পর হঠাৎ তারা একদিন বিষ্ণুর নাভিমূলে ব্রহ্মাকে দেখতে পেল। দেবীর কাছ থেকে বর পেয়ে তারা তো বেপরোয়া। ব্রহ্মাকে বলল—দ্যাখো ঠাকুর, এই জলের মধ্যে শুধু আমরা থাকব। তুমি আবার কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছ বলো তো? ভাল চাও তো মানে-মানে সরে পড়ো। তা না হলে আমরা তোমাকে একদম শেষ করে ফেলব। ব্রহ্মা তখন দারুণ ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর হাতে আবার তো কোনো অস্ত্র নেই। তাই তিনি বিষ্ণুর ঘুম ভাঙানোর জন্য তাঁর স্তব আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ ধরে স্তুতি করেও বিষ্ণুর ঘুম ভাঙানো গেল না। ব্রহ্মা তখন খুব ভয় পেয়ে গেলেন। আর উপায় না দেখে তিনি যোগনিদ্রাদেবীর আরাধনা শুরু করলেন। এই দেবীরই আর-এক নাম মহামায়া চণ্ডী। ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী তখন বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা থেকে মুক্ত করে দিলেন। বিষ্ণু ঘুম ভেঙে উঠে দেখেন যে মহাবিক্রমশালী মধু-কৈটভ ব্রহ্মাকে বধ করতে উদ্যত হয়েছে।"

এই পর্যন্ত বলে দাদু একটু দম নেবার জন্য থামলেন। তারপর পিন্টুকে জিজ্ঞেস করলেন, "এর পরে কী হতে পারে বলো তো দাদু?"

পিন্টু বিজ্ঞের মতো উত্তর দিল, "এরপর রাম-রাবণের যুদ্ধের মতো যুদ্ধ হল নিশ্চয়ই।"

দাদু খুব খুশি হয়ে পিন্টুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ছোট্ট পিন্টুর কিন্তু খুব বুদ্ধি। ঠিক ধরতে পেরেছে।

"তাই হল। শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। সে কী ভীষণ যুদ্ধ! কেউই কম যায় না। যুদ্ধ চলল পাঁচ হাজার বছর।"

বিল্টু অবাক হয়ে বলল, "ওরে বাব্বা! এতদিনেও দেবতারা অসুরকে মারতে পারল না?"

দাদু বললেন, "পারবে কী করে? দেবী মহামায়ার বরে অসুরদের তো কেউ বধ করতে পারবে না।"

"বা! তাহলে তো যুদ্ধ কোনোদিনই শেষ হবে না।" মিন্টু বলল।

দাদু বললেন, "শোনো তারপর। এই দারুণ যুদ্ধ যখন চলছে, তখন অসুররাই একদিন বিষ্ণুকে বলল—হে দেব! তোমার ক্ষমতায় আমরা উভয়েই মোহিত হয়েছি। অতএব তুমি আমাদের কাছে বর চাও।"

বিল্টু বলল, "সে আবার কী দাদু! অসুর দেবে দেবতাকে বর?"

দাদু বললেন, "অসুররা দেবতার আশীর্বাদপুষ্ট—তারাও বর দেবার ক্ষমতা রাখে। তাই বিষ্ণু তখন বললেন—যদি তোমরা আমার যুদ্ধে তুষ্ট হয়ে থাকো, তবে তোমরা উভয়ে আমার বধ্য হও। মধু ও কৈটভ তখন বলল—হে দেব, আপনার হাতে মৃত্যু হওয়া তো অতি গৌরবের কথা, কিন্তু চতুর্দিকে জল, আপনি আমাদের কোথায় বধ করবেন? পৃথিবীর যে-জায়গায় জল নেই, এমন জায়গায় আমাদের বধ করুন। বিষ্ণু তখন মধু ও কৈটভকে নিজের উরুর উপর রেখে চক্র দিয়ে তাদের মাথা কেটে ফেললেন। তখন সেই অসুরদের রক্ত মাংস মেদ সব আস্তে আস্তে জলে পড়তে লাগল। অসুরের মেদ মাংস—সে তো আর একটু-আধটু নয়—তাতে কারণ-সমুদ্র পূর্ণ হয়ে গেল। মেদ দিয়ে যা সৃষ্টি হল, তার নাম হল মেদিনী, অর্থাৎ পৃথিবীর আর-এক নাম হল মেদিনী। আর মধু নামক অসুরকে বধ করার জন্য বিষ্ণুর আর-এক নাম হল মধুসূদন।"

ছোট্ট পিন্টু বলে উঠল, "ভাগ্যিস অসুর দুটো মরেছিল—তাই মেদিনী হল—আর আমরা মেদিনীতে বাস করতে পারলাম! তা না হলে তো জলে ডুবেই মরে যেতাম।"

পিন্টুর কথা শুনে সবাই সশব্দে হেসে উঠল। এমন-কী দাদুও!

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

বানানের ছড়া

দেব সেনাপতি

ণ

মাণিক্য তো চাণক্যের পণে
বাণিজ্যেতে লাল হল এসে
তীক্ষ্ণ মৃত্যুবাণ রাখে তূণে
বণিকের অমায়িক বেশে।
হরিছে নিপুণ দুটি পাণি
ফণীর মাথার মণি হেসে
বেণু-স্বর, মুখে পুণ্য-বাণী
অতি ভক্তি মা-কালী গণেশে
নগণ্য লাবণ্য যাহা ছিল
অঙ্গের লবণে গিয়ে মেশে
অর্থের কল্যাণে দোষে-গুণে
পণ্যের বিপণি দেশে দেশে।
অণুমাত্র লাভের কণিকা
দেবে কি কাউকে ভালবেসে?
অর্থ তার বক্ষের শোণিত
তারই চাপে মরে অবশেষে।

ণ

মৃণাল মুখর, কিন্তু
গৌণ ব্যাপারেতে তারা
বীণাদি ভেজায় বেণী
কোণে বসে দেখে তারা

ন

চিন্ময় মৃন্ময়
মৌন হয়ে রয়।
বিনা প্রয়োজনে
হাসে মনে-মনে।

ণ

ম্রিয়মাণ অপরাহ্ণ, ভ্রাম্যমাণ মেঘেরা উধাও।
হিরণ্ময় শেষবার সর্বাঙ্গীণ আশীর্বাদ দাও।
প্রাঙ্গণে করুণ পুষ্প রুগ্‌ণ চোখে কী চায় শুধাও।

ন

ফেনিল সাগর চায় গগনের পানে,
ফাল্গুনে অঙ্গন ছায় মধ্যাহ্নের গানে।

ছবি : সুনীল শীল

বাঘ মরেছে

অরুণ সরকার

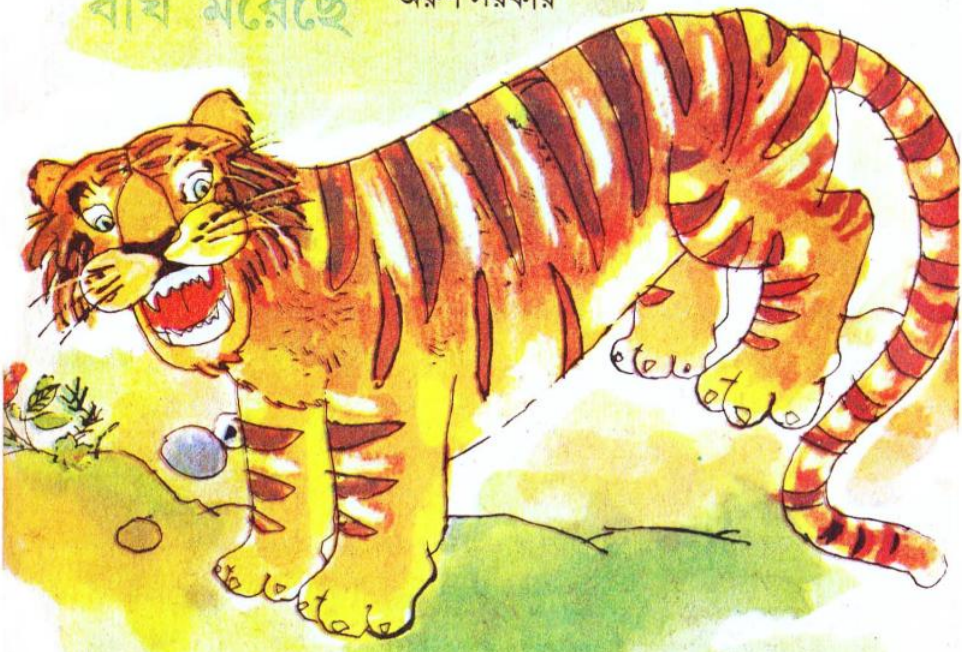

সাতসকালে ভালুকপাড়ায়
কাক ডাকল, 'কা-কা কা-কা,
বাঘ মরেছে, শিগ্রি ওঠো
এবার তোমার লাইন ফাঁকা।'

সারা রাত মহুয়া খেয়ে
ভালুক বসে ঝিমোচ্ছিল,
নেশার ঘোরে বলল, 'কেন?
বাঘটা তখন কী কচ্ছিল?'

কাক বলল, 'তোমার মাথা
মরলে আবার করবেটা কী?
বেহুঁশগুলোর এমনি দশা-ই,
যাই, দেখি আর কাউকে ডাকি।'

উড়ে উড়ে কাক তো গেল
জলার ধারে নেকড়ে-পাড়ায়,
নেকড়ে তখন আপনমনে
একটা হাঁসের পালক ছাড়ায়—

কাককে দেখে বলল, 'কী রে,
ভাগ বসাতে আসলি বুঝি?'
কাক বলল, 'কী ছোটলোক,
আমি আবার তোকেই খুঁজি!'

ঝটকা দিয়ে ঝাপটে পাখা
উড়ল তো কাক, উড়তে উড়তে
দেখল শুয়োর যাচ্ছে তখন
কচুবনের মাটি খুঁড়তে।

কাক চ্যাঁচাল, 'বাঘ মরেছে,'
শুয়োর শুনে বলল, 'না কি?
কবর দেবার সময় ডেকো
আমি তো এই কাছেই থাকি।'

তাই শুনে আর থামল না কাক,
কাছেই ছিল মস্ত ভাগাড়,
কাক দেখল, একটা কোনায়
হায়না বসে চিবোচ্ছে হাড়।

কাক বলল, 'বাঘ মরেছে,'
হায়না বলল, 'সকালবেলা
কী শোনালি? জগদম্বা!
সবই তোমার লীলাখেলা।'

কাক বলল, 'দেখতে যাবেন?'
হায়না বলল, 'পারব না রে,
শোকের ব্যাপার, ওসব আমার
সহ্য হয় না এক্কেবারে।'

কাক বলল, নিজের মনে—
এই তো বাজার! এখন তবে
বাকি রইল শুধু শেয়াল,
এবার তাকেই বলতে হবে।

শেয়াল শুনে বলল, 'উঁহু,
বাঘরা ভীষণ ঘাপটি মারে,
মড়ার মতন পড়ে থাকে
সুযোগ বুঝে লাফটি মারে।'

কাক বলল, 'আরে না না,
মড়া আবার লাফ দেবে কী?'
শেয়াল বলল, 'তাহলে চল্,
সত্যিমিথ্যে গিয়েই দেখি।'

কাক চলল উড়ে উড়ে
শেয়াল ছুটল পিছু-পিছু
অনেক ঘুরে বলল, 'কী রে,
দেখছি না তো কোনো কিছু—'

কাক বলল, 'এই তো ছিল
এরি মধ্যে ভূত হয়েছে!'
শেয়াল বলল, 'ওর নাম বাঘ
ভূত হতে ওর বয়েই গেছে।'

বলতে বলতে বন কাঁপিয়ে
আওয়াজ হল হালুম হালুম—
শেয়াল বলল, 'কী রে কাউয়া!
এখন কিছু হচ্ছে মালুম?'

ছবি দেবাশিস দেব

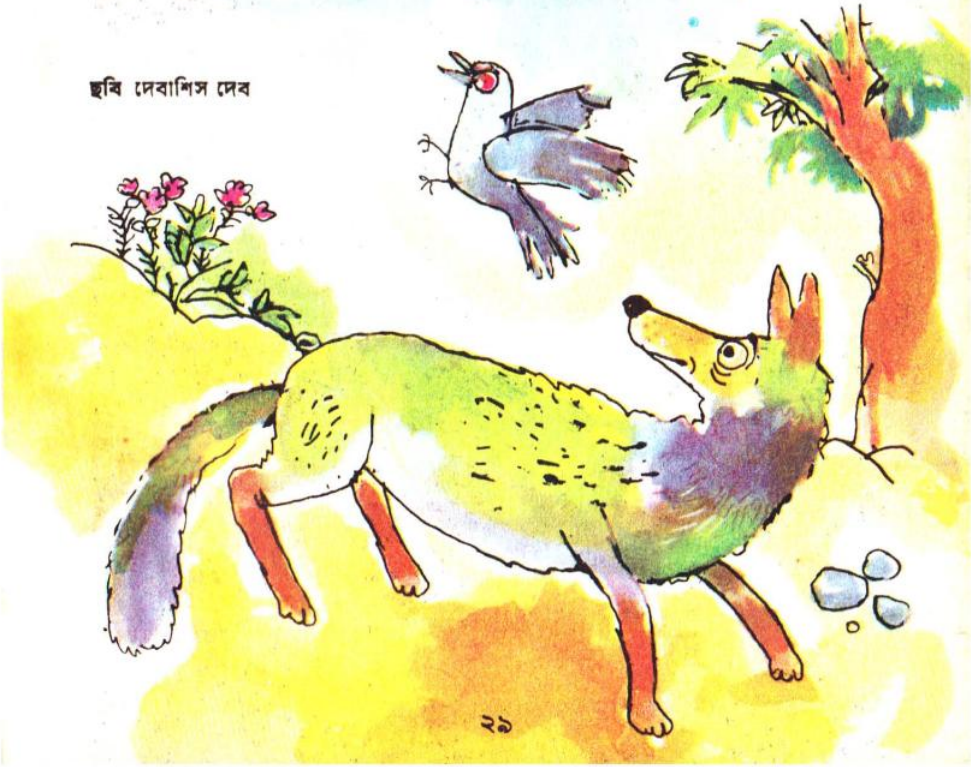

রোভার্সের রয়

দু কোটি টাকার লোভ দেখানো সত্ত্বেও বসরানের কোচ হতে রাজি হয়নি মেলচেস্টার রোভার্সের খেলোয়াড়-ম্যানেজার রয়। কিন্তু তার স্ত্রীকে কি হাত করেছে ওরা?
দ্যাখো দ্যাখো, রয় কীভাবে কাটাল!
দারুণ খেলোয়াড়!
বল পাবার জন্যে জেরি ছুটছে!
রয় বল দিলেই গোল করবে!
রয় কিন্তু নিজেই শট নিল...
পোস্টে লেগে বল ফিরে আসছে!
জেরিকে পাস করা উচিত ছিল!
আবার আক্রমণ চালিয়েছে রোভার্স...
নাও রয়!
মাথা ছোঁয়ালেই গোল হবে!
কিন্তু হল কোথায়?
বার-এ লাগল!
যাচ্চলে!
আর-কাউকে বল দিচ্ছে না!
রয় বড্ড বাজে খেলছে!
দু-দুটো সুযোগ নষ্ট হল!
টেলিভিশনের ধারাভাষ্যকার
গোল করবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে রয়...
কিন্তু সফল হচ্ছে না!

অন্যকে দিয়ে চেষ্টা করালে হয়তো ভাল হত!
আরে!
অন্যায়ভাবে বাধা দেবার জন্যে রোভার্সের বিরুদ্ধে ফ্রী কিক!
ডালটন ফ্রী কিক পেয়েছে...
ওকে সরে যেতে বলুন!
নাঃ, রয় যে কী করছে আজ!
রয়, সরে এসো!
রয়ের আচরণ আজ অদ্ভুত ঠেকছে সকলের...
ন-নম্বরকে আটকাও!
বল ওদিকে গেছে!
রোভার্স দল বিভ্রান্ত!
ফলে...
গোল! গোল!
শাবাশ!
ডালটন! ডালটন!
বিরতির সময়ে...
ড্রেসিং রুমে যাচ্ছ বেন?
হ্যাঁ, রয় কী বলে শুনি!
রোভার্সের জেনারেল ম্যানেজার বেন গ্যালোয়ে...
কেন আমরা গোল খেয়েছি জানো?
VISITORS
শোনা যাক!
স্রেফ তোমার জন্য, রয়!
তুমি বাজে খেলছ!
এ কী!
রয়ের উপরে সবাই খাপ্পা!
ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বলে গিয়ে...
খেলায় মন দাও! নয়তো আমরা ডুবব!
রয় কি আর খেলায় মন দিতে পারবে?

ছেলেটা কে?
আমার ভাগ্নে আলভারো...
পর্তুগাল থেকে এসেছে। তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে নিয়ে এলুম।
হ্যাঁচ্চো!
বাপ-মা-মরা ছেলে। এখানে আমার দোকানে থেকে কাজকর্ম শিখবে।
আমরা বড়রা কথা বলছি। যাও, তুমি একটু বাগানে গিয়ে খেলা করো।
যাচ্ছি মামা।
কিন্তু হ্যাঁ, দুষ্টুমি কোরো না। গোলমাল কোরো না। প্রফেসর স্মিথ পড়াশুনো করছেন। তাঁকে বিরক্ত কোরো না।
ঠিক আছে।
যা করবার, চটপট করতে হবে।
ওইটে নিশ্চয় প্রফেসর স্মিথের পড়ার ঘর...
দেখা যাক, লোকটা আছে কি না...
ঢিল ছুঁড়লেই বোঝা যাবে।
মনে হচ্ছে কেউ নেই।
আবার দেখি।
নাঃ, নেই! যাক!
ঠিক আটকেছে! কপাল ভাল!
ওঠা গেছে!
সাবধানে ঢুকতে হবে।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শব্দ-সন্ধান

■	১		২		৩	■
		■		■		■
৪					৫	
■						■
৬		■		■	৭	৮
	■	৯	■	১০	■	
১১			■	১২		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) বন্ধুর সাফল্যে তাকে তুমি কী জানাও? (৪) যে-গাছ কোনো দিনই সাবালক হতে পারে না। (৫) দড়ি। (৬) বীর। (৭) হালকা। (১১) পাখিবিশেষ। (১২) মাছবিশেষ।
উপর-নীচ : (১) সূর্য। (২) হিমালয়। (৩) কোটাল। (৬) বর্ষাকালে লাগে। (৮) নূপুর। (৯) দরজা। (১০) বাতি।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

বা	গু	রা	■	পে	শো	য়া
■	হ	■	গী	■	ণ	■
বি	■	জা	ত	ক	■	কৌ
দ্রো	ণ	■	গো	■	দা	ন্তে
হী	■	কু	বি	ন্দ	■	য়
■	ম	■	ন্দ	■	পি	■
ব	ল্ল	ম	■	জো	লু	ই

ধাঁধা

"গৌরীর এবারের ধাঁধাটা ফার্স্টক্লাস।" ছোট্‌কা ফের যেন নিজেকেই বলল, "ওকে একটা থ্যাঙ্কস দিতে হবে।"

ধাঁধাটা যে কী, তখনও জানি না। কিন্তু ছোটকার হাসি-হাসি মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম, খুব জব্বর কোনও ধাঁধা পাঠিয়েছে গৌরী, আমার মামাতো বোন। নইলে ছোটকা এতবার করে বলতও না।

আমি চুপ করে আছি দেখে ছোটকা তাড়া লাগাল, "কী সতুবাবু, কাগজ-কলম কই! লিখবে না ধাঁধাটা?"

আমি বললাম, "কেন লিখব না। কিন্তু তুমি তো ধাঁধাটাই বলছ না। শুধু দারুণ, মার্ভেলাস, ফার্স্ট ক্লাস—এইসব বলে চলেছ।"

ছোটকা হো-হো করে, হেসে উঠল, "সরি, সতুবাবু। ভেরি সরি। নাও, লেখো।"

আমি লিখে ফেললাম।

প্রথম ধাঁধা ॥ অদিতি, বিভা, শীলা, ডোনা আর ইলা; পাঁচ বন্ধু। এবার পুজোয় পাঁচ বন্ধু নিজেদের মধ্যে বই উপহার দেওয়া-নেওয়া করেছে। প্রত্যেকে কিনেছে চারটে করে বই। প্রত্যেকে পেয়েছে চারটে করে বই। প্রত্যেকেই বই কিনে অন্যকে উপহার দিয়েছে, কিন্তু দেবার ধরন প্রত্যেকের আলাদা। কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। একজন হয়তো চারটে বই দুই বন্ধুকে দিল—দুটো-দুটো করে, আরেকজন হয়তো চারটে বই-ই দিল এক বন্ধুকে, আবার কেউ হয়তো একজনকে দিল তিনটে, একজনকে একটা—এইরকম আর-কি। এক বন্ধুর উপহার-ভাগের সঙ্গে অন্য বন্ধুর উপহার-ভাগের কোনও মিল নেই।

যেমন অদিতি তার কেনা চারখানা বই বিভা-শীলা-ডোনা-ইলা এই চারজনকে দিয়েছে, প্রত্যেককে একখানা করে। বিভা আবার তার কেনা চারটে বই-ই দিয়েছে শুধু অদিতিকে। শীলা তিনটে বই দিয়েছে ইলাকে, আর চার-নম্বর বইটা দিয়েছে— না, আর বলব না। ডোনার পাওয়া চারটে বই কে-কে দিল, বার করো তোমরা, তখনই জানতে পারবে কে কাকে কীভাবে বই উপহার দিয়েছে। হ্যাঁ, যেটুকু বলা আছে, তার থেকেই বাকিটা বার করা যাবে। শুধু একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবা।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ পরবর্তী সংখ্যাটি কত?

২২ ২৪ ২৮ ৩৬ ৫০ ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

পা ত শী টি ল

গতবারের উত্তর ॥ (১) বাঘ পান খায় না, তাই প্রথমে ছাগল নিয়ে ওপারে যাবে। ছাগল রেখে একলা ফিরে আসবে। এরপর যাবে পান নিয়ে। ওপারে পৌঁছে পান রেখে ছাগল নিয়ে ফিরে আসবে এ-পারে। ছাগলটাকে এ-পারে রেখে বাঘটাকে নিয়ে ওপারে পৌঁছে দেবে। পান আর বাঘ রইল ও-পারে। লোকটা একলা ফিরে এসে ছাগল নিয়ে পার হয়ে যাবে। (২) চারটে পেয়ারা, তিনজন ছেলেমেয়ে। (৩) অনবধানতা।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

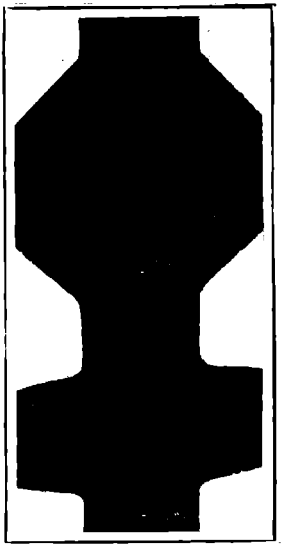

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল মারবেলের ফোটো

ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ বনমহোৎসবে সবাই বলছে গাছ লাগাতে, কী গাছ লাগাই বলুন তো?

উঃ ছেলেবেলায় পয়সা চাইলেই মা বলতেন, টাকার গাছ লাগিয়েছি? সেই গাছটাই এবার লাগানো যাক।

প্রঃ আপনার জীবনের সবচাইতে স্মরণীয় মুহূর্ত কোনটি?

উঃ প্লেনে চড়েছি, আকাশে উঠবার পরে মাইকে ঘোষণা শুনতে পেলাম, "এ-প্লেনটা সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রচালিত, পাইলট-টাইলট কিচ্ছু নেই। কিন্তু আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, এর যন্ত্রপাতি কখনও খারাপ হতে পারে না—কখনও খারাপ হতে পারে না—কখনও খারাপ হতে পারে না..."

সুসেন

মজার খেলা

এ-খেলার জন্য চাই চব্বিশটা দেশলাইকাঠি আর একজন বন্ধু।

প্রথমে চব্বিশটা কাঠি দিয়ে নীচের ছবির মতন নটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করো—

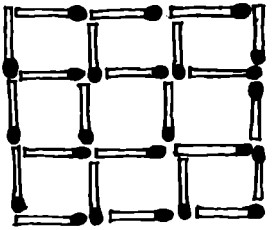

এবার বন্ধুকে বলো, চব্বিশটা কাঠি দিয়ে সাজানো নটি বর্গক্ষেত্র রয়েছে তার চোখের সামনে। তাকে এর থেকে আটটা কাঠি এমনভাবে সরাতে হবে যে, মাত্র দুটো বর্গক্ষেত্র পড়ে থাকবে টেবিলে।

ব্যাপারটা শুনতে খুব সোজা। কিন্তু হাতে-কলমে করাটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বন্ধু এদিক-ওদিক থেকে কাঠি সরিয়ে-সরিয়ে নানান ভাবে চেষ্টা করে যাক। তুমি শুধু চুপ করে দেখে যাও। এখন কিছু বলবে না।

সে যদি পারে, খুবই ভাল কথা। কিন্তু যদি না পারে? তখন তো তোমাকেই করে দেখাতে হবে উত্তরটা। সুতরাং তুমি নিজেই চেষ্টা করে দ্যাখো, পারো কিনা।

যারা পারলে না, তাদের জন্য বরং উত্তরটা দেখিয়েই দেওয়া যাক। নীচের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে, কীভাবে আটটা কাঠি সরিয়ে দুটি বর্গক্ষেত্র ফেলে রাখা যায়—

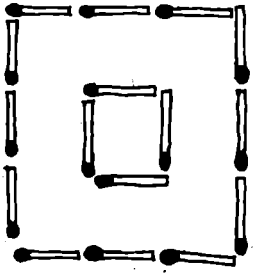

মজারু

হাসিখুশি

"অমনভাবে ফল খাস না বুকুন। ফলের ভেতরে অনেক সময় পোকা-টোকা থাকে, পেটে যাবে। দেখে খাস।"

"ঘাবড়াবার কিছু নেই ঠাকুমা। আমার খাওয়া দেখে পোকারাই সাবধান হয়ে যাবে।"

"আমাদের এখানে এখন কোনো চাকরি খালি নেই। যদি চাকরির খুব দরকার হয়, তবে বছর পাঁচেক বাদে দেখা করবেন।"

"ধন্যবাদ। কিন্তু কখন আসব স্যার, সকালে না বিকেলে?"

• • •

"বাড়িঅলাকে গিয়ে বলে এসো, আমি বাড়ি নেই। বড় জ্বালাচ্ছে লোকটা।"

"স্যার, বাড়িঅলা কি বিশ্বাস করবে আমার কথা? উলটে আমাকেই দাঁত খিঁচোবে।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি নিজেই গিয়ে বলে আসছি।"

"দ্যাখো তো হে, কীরকম হয়েছে ছবিটা। ছবির নাম দিয়েছি 'অস্তিমলগ্ন'।"

"বাঃ, ভারী সুন্দর এঁকেছ তো! এনকেফেলাইটিস রোগের প্রতিটি লক্ষণই লোকটির চোখে-মুখে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছ।"

• • •

"জ্যোতিষী খুব ছেলেবেলায় আমার হাত দেখে বলেছিল, আমি বড় হয়ে নাকি অনেক ওপরে উঠব। জ্যোতিষীর কথা বর্ণে-বর্ণে মিলে গেছে। সত্যিই আমি অনেক ওপরে উঠেছি। আমি এখন বাইশতলা বাড়ির লিফটম্যান।"

ছবি দেবাশিস দেব

দশে এক

বিশ্বের প্রতি ১০টি শিশুর ভেতর একটি করে শিশু অসম্পূর্ণতা নিয়েই জন্মায় অথবা শিশুবয়সে ওই খুঁতের শিকার হয়। ফলে সে আংশিক অথবা পুরোপুরি অন্ধ বা বধির, জড়বুদ্ধি, সীমিত শারীরিক ক্ষমতার অধিকারী কিংবা শেখায় অক্ষম হয়ে পড়ে। এদের চাই বিশেষ যত্ন...সময়মতো চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ—যাতে ওরা দৈহিক অসঙ্গতিজাত অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে। এ-ব্যাপারে বাবা-মা, পরিবারের ও কাছেপিঠের লোকজনদের সহানুভূতি আর উৎসাহ ওদের একান্ত প্রয়োজন।

এই সমস্যা আকারে যেমনই হোক, প্রতিকার একেবারে সাধ্যাতীত নয়। খুঁত বলতে বোঝায় শরীরে অথবা মনে ক্রিয়াশীল কোনো অংশের ত্রুটি অথবা বিলুপ্তি। অনেক খুঁত থেকে সৃষ্টি হয় অক্ষমতার, ফলে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা, দেখা, শোনা, বোঝা, এইসব নানা বিষয়ে ব্যাঘাত ঘটে। প্রতিকূল পরিবেশ ও অবহেলা এই অক্ষমতাকে প্রতিবন্ধকতায় নামিয়ে আনে—একটি শিশুর স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথ যায় রুদ্ধ হয়ে। কিন্তু সময়ে যত্ন নিলে অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা দূর করে অক্ষমতা প্রতিহত করা যায়—একটি দুঃখিত জীবনকে দেখানো যায় সুখে বাঁচার পথ।

বাস্তবে অবশ্য অনেকক্ষেত্রেই এইসব শিশুদের যত্ন বা উৎসাহ কিছুই মেলে না। সুখী সক্রিয় নাগরিক হয়ে বেড়ে ওঠার সম্ভাবনাও অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের দিন কাটে নির্মম নিঃসঙ্গতার মধ্যে। সমাজে ওরা বাতিল হয়ে যায়।

এমনটিই ঘটে, যেহেতু সকলে আশা করেন যে, সব শিশুই যথারীতি বড় ও বিকশিত হবে। শিশুর কোনো অসঙ্গতি চোখে পড়লে আমরা শুধু লক্ষ করি গোলমালটা কীসে। কখনও এটা ভাবি না যে, এই ত্রুটি শোধরানো বা কমিয়ে আনা সম্ভব। কেন আমরা এ-কথা উপলব্ধি করি না যে, অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এইসব শিশুর মধ্যে সামর্থ্য, নৈপুণ্য ও ইচ্ছাশক্তি রয়েছে—শুধু সেগুলিকে জাগিয়ে দিতে হবে। সহায়তা পেলে ওরা বিকশিত হবে, আমরাও বুঝতে পারব ওদের প্রকৃত ক্ষমতা। কেন তবে ওদের ব্যর্থ হতে দেব?

দৃষ্টান্ত তোমাদের সামনেই রয়েছে। ভাবো তো, যাদের তোমরা চেনো, রোজ দেখছ—তাদের কথা। অনেকেই সার্থক জীবন কাটাচ্ছে, রাস্তায় ভিক্ষেও করছে কিছু লোক, অনেকে তোমাদের প্রতিবেশী বা বন্ধু; অন্যান্যদের হয়তো দেখেও দেখ না।

যাঁরা পুরু কাচের চশমায় দেখেন, অথচ খুললেই চোখ ঝাপসা, তোমরা তো তাঁদের প্রতিবন্ধী ভাবো না। কারণ তোমরা জানো, ওঁদের অনেকেই ইতিহাস অথবা টেব্‌ল টেনিসে পারদর্শী, সঙ্গীতপ্রিয় বা বিতর্কে চৌকস...কিংবা শুধু সঙ্গী হিসেবেই চমৎকা[illegible]যার পোলিও অথবা কোনো দুর্ঘটনা[illegible]জাত আছে, সেও হয়তো একই গুণে গুণী, তোমার যে

শখ, তারও সেই একই শখ। কত লোকই তো তোতলা অথবা বদ্ধ কালা। এরাও কিন্তু জীবনে সফল হতে যথেষ্ট চেষ্টায় সক্ষম। কেবল খুঁতের জন্যে এরা তোমাদের থেকে পৃথক নয়, তফাত হল এই যে, একই লক্ষ্যে পৌঁছতে ওদের অনেক বেশি মেহনত করতে হয়। অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং কিছুটা ভাগ্যের জোরে পেরেও যায়।

কয়েকজন তো দারুণভাবেই পেরেছেন। বিশ্ব-খ্যাত লেখিকা ও বক্তা হেলেন কেলার ছিলেন আশৈশব অন্ধ ও বধির। চিত্রকর বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় অন্ধ অবস্থাতেও আঁকতেন, আঁকা শেখাতেন। পোলিওতে জখম হয়েও ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট তো হেরে যাননি, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হুসেনের চোখে খুঁত ছিল। একই খুঁত কবি ও লেখক পি. লাল-এর। এভারেস্ট আরোহী এইচ. পি. এস. আলুওয়ালিয়া হুইল চেয়ারে বসেও অক্লান্ত কর্মী—বই লিখছেন, পর্বতারোহণের অগ্রগতিতে উদ্যোগী তিনি আজও। যে বেদ মেহতার বইয়ের বিপুল কাটতি, তিনিও তো অন্ধ। টেস্ট খেলোয়াড় চন্দ্রশেখরের একটি বাহু পোলিওতে জখম হলেও তুখোড় স্পিনার হিসেবে বিশ্বে তাঁর কী সুখ্যাতি!

সকলেই এরকম বিখ্যাত হন না, কিন্তু সাহস আর সংকল্পের জোর তাঁদেরও কম নয়। করুণার বদলে সমাজের সাহায্যই তাঁরা পেয়েছেন। প্রতিবন্ধী-দশার দুর্ভাগ্য থেকে তাঁদের মুক্তি না মিলুক, সেই দুর্ভাগ্যকে জয় করতে পেরেছেন তাঁরা।

এই প্রতিবন্ধীদের কেন আমরা সমাজের বোঝা হিসেবে ভাবব? সুযোগ পেলে সমাজকে তাঁরাও অনেক কিছুই দিতে পারেন। এই সমাজ তো আমাদের সবাইকে নিয়ে। প্রতিবন্ধীদের জন্যে যে দরজা আজও সবটা খোলেনি, আমরাই পারি তা খুলে দিতে।

চোখ

চোখ হল অন্যতম প্রধান ইন্দ্রিয়, স্বাভাবিক জীবনযাপন ও কাজকর্মের পক্ষে দৃষ্টিশক্তি একান্ত জরুরি। চোখ ছাড়া নিজেকে একবার ভাবো! তোমার ঘরের ভেতর চোখ বুজে চলাফেরা করলেই বুঝবে। ও-ভাবে বাইরে বেরোতে সাহস পাও? ঠিকমতো খেতে পারো? নিজের জন্যে এক কাপ চা তৈরি করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। এবারে চোখ খোলো—কী স্বস্তি! জানো কি, পৃথিবীতে চার কোটি কুড়ি লক্ষ লোক চোখে দেখে না?

শুনলে অবাক হবে যে, এই অন্ধদের ৮০ শতাংশের কিন্তু এ-অবস্থা হওয়ার কথা ছিল না। রোজকার খাবারে যথেষ্ট ভিটামিন 'এ' না-থাকায় বিশ্বে প্রতি বছর ২,৫০,০০০ শিশু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাদের অভিভাবকরা যদি আম, পেঁপে আর শস্তা শাকপাতা তাদের জন্যে জোটাতে পারতেন, তবে ওই শিশুদের দৃষ্টিশক্তিও প্রখর হত।

দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যাপক চোখের রোগ হল ট্রাকোমা—মাছি ও ধুলো থেকে এই রোগের বিস্তার ঘটে। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও শরীরের সামান্য যত্ন নিলেই এই রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অন্যান্য সংক্রমণ এবং দুর্ঘটনা থেকেও চোখের ক্ষতি হয়—সবসময় তা রোধ করা না-গেলেও, দ্রুত চিকিৎসা করিয়ে নিতে বাধা কোথায়?

অন্ধতা ও চোখের ক্ষত দূর করতে হলে মা ও শিশুর জন্যে যথেষ্ট ভাল পথ্য, রোগ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি, ঘরে-বাইরে দুর্ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তামূলক নানা ব্যবস্থা অবলম্বন—এগুলি খুবই সহায়ক। বাবা-মা, প্রতিবেশী ও বন্ধুরা অন্ধ বা ক্ষীণদৃষ্টি শিশুকে চলতে শেখায় সাহায্য করে স্ব-নির্ভরতা এনে দিতে পারেন। শিশু ব্রেল-পদ্ধতিতে লিখতে পড়তে পারে, স্কুলে যাওয়া ও খেলাধুলায় অংশ নেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব। অনেকে ভাবেন যে, অন্ধ শিশুরা কেবল সঙ্গীত অথবা বেতের কাজেই পটু হয়; এই ধারণা একেবারেই ভুল। সমাজ সুযোগ দিলে অন্ধ ও আংশিক দৃষ্টিধারীরা তাদের সামর্থ্য ও সাফল্যে আমাদের চমকে দিতে পারে।

তোমাদের চেনা কোনো অন্ধ অথবা প্রায়-অন্ধকে তোমরাও সাহায্য করতে পারো। তাদের সঙ্গে বন্ধুতা পাতাও। মনে রেখো, অন্ধরা ধ্বনি ও স্পর্শ-নির্ভর। কোনো অন্ধর সঙ্গে দেখা হলে কথা বলার সময় নিজের পরিচয় দাও, ওদের নাম ধরে ডেকে কথা বলো যাতে বুঝতে পারে কার সঙ্গে কথা বলছে।

অন্ধকে শেখাতে গিয়ে তার সঙ্গে জোর-জবরদস্তি করবে না। ওর বাহু জাপটে ধরার বদলে ওকে এগিয়ে এসে তোমাকে ধরতে দাও। সিঁড়ি থাকলে সে-কথা না-বলে ওকে বলো: 'ওঠো' অথবা 'নামো'। সিঁড়ির ধাপ বেশি উঁচু অথবা নিচু হলে সেটা জানিয়ে দাও।

দৃষ্টিহীন বন্ধু তোমার বাড়িতে এলে দরজা-জানলা আধ-খোলা রেখো না। রাখলে তার পাল্লায় সে ধাক্কা খেতে পারে। ওকে বলে দাও কোথায় আসবাব ও অন্যান্য জিনিস রাখা আছে। একসঙ্গে বেরুলে, তুমি যা দেখছ তার বর্ণনা দিয়ে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নাও।

কান

তুমি কি সঙ্গীতপ্রেমী? তবে তো প্রায়ই রেডিয়ো খুলে প্রিয় গান শোনো। যেখানে তুমি থাকো, সে জায়গাটা কি সর্বক্ষণ পাখির ডাকে মুখর? তুমি কি ডাক শুনেই বুঝতে পার কোন্ পাখি ডাকছে? যানবহুল রাস্তা পেরোবার সময় তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ গাড়ি-ঘোড়ার শব্দও তোমাকে চলতে শেখায়। আবার নিরালা দিনে বন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনে কী ভালই না লাগে।

কিন্তু একবার শব্দহীন জগতের কথা ভাবো তো। মনে করো যে, বাবা-মার কথা-বার্তা, তোমার প্রিয় কোনো রেডিয়ো-প্রোগ্রাম, হাসির আওয়াজ কিছুই তুমি শুনতে পাচ্ছ না। পৃথিবীর ৭ কোটি লোক এই অবস্থায় কাটাচ্ছে। এদের মধ্যে যারা শিশু, শুনতে পায় না বলে কথা বলতেও তারা শেখে না। অথচ কথা বলার জন্যে তারা কী কষ্টকর চেষ্টাই না চালাচ্ছে।

শ্রবণশক্তি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যেমন: কানের সংক্রমণ অবহেলিত হলে, মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেলে, কানের ভেতরে কোনো ক্ষত থাকলে, জন্মের সময় অক্সিজেনের ঘাটতি হলে। কান ফাটানো চড়া আওয়াজও আরেকটি কারণ। গর্ভবতী নারী যদি গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসের মধ্যে জার্মান হাম, মাম্‌স বা জলবসন্তে আক্রান্ত হন, তাঁর শিশুর ক্ষতিগ্রস্ত শ্রবণেন্দ্রিয় নিয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

শিশু বধির হতে পারে বাবা-মা, দাদু-ঠাকুমার কোনো খুঁত বংশগত সূত্রে পেয়েও। সুস্থ, স্বাভাবিক শিশু বিশ্বকে চেনে শব্দ ও দৃশ্য দিয়ে। বধির শিশু চেনে এক নীরব বিশ্ব। শব্দের সঙ্গে পরিচয় না-থাকায় 'বোঝা ও বোঝানোর' সমস্যা তার থেকেই যায়। আমরা বলে থাকি 'মূক ও বধির'—আসলে ওরা শুধুই বধির। কথা শুনতে পায় না বলেই কথা বলতেও পারে না।

এখন প্রশ্ন, কীভাবে আমরা বধির শিশুদের আমাদের ভাষা ও শব্দের জগতে নিয়ে আসতে পারি।

অল্প শুনতে পায় এমন লোক শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্রের সাহায্যে উপকৃত হতে পারে। শিশুদের বেলায় অনেকেই এটা খেয়াল করেন না যে, শিশুটি আংশিক বধির। তাঁরা ভাবেন শিশুটি হাবা বলেই কিছু বুঝতে পারে না।

তিনটি সুন্দর পদ্ধতিতে বধিররা আমাদের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করতে পারে। এক: কথা বলার সময় আমাদের ঠোঁট নাড়া দেখে; দুই: মূক-বধিরদের হাতের মুদ্রার বর্ণমালা ব্যবহার করে; তিন: হাত নেড়ে বোঝানোর ভাষা থেকে। বধির শিশুরা এই চমকপ্রদ পদ্ধতিতেই নিজেদের মধ্যে "কথা বলে"। তুমিও পারবে। কোনো বধির শিশুর কাছ থেকে শিখে নাও।

একজন বধিরের সঙ্গে বন্ধুতা পাতিয়ে লক্ষ্য করো, কত দূর একে অন্যকে বুঝছ। যখন কথা বলবে, ওকে তোমার মুখ দেখতে দাও। পরিষ্কার করে ধীরে-ধীরে কথা বলো। বধির ব্যক্তি কথা বলার চেষ্টা করলে উৎসাহ দাও। ওদের নির্বাক নিঃসঙ্গ রেখো না। দেখবে, ভাব-বিনিময়ের অনেক কিছু আছে।

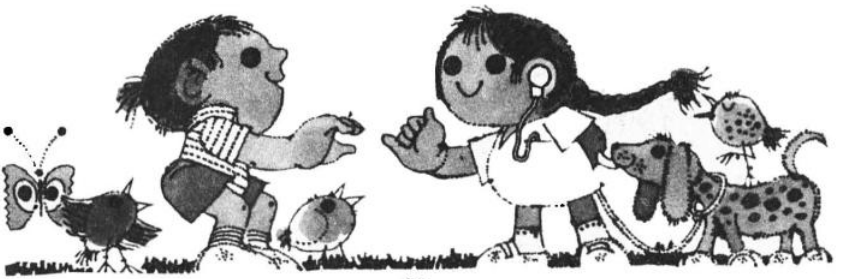

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

তোমরা কি খেলাধূলা ভালবাসো? সিঁড়ির দু-ধাপ এক লাফে পেরোতে চাও? বল ছুঁড়তে পারো অন্যদের চেয়ে বেশি জোরে? ধরো, তোমার এক হাত বেঁধে রেখে দেওয়া হল অথবা একটি পায়ে লাঠি লাগিয়ে দেওয়া হল এমনভাবে, যাতে তুমি হাঁটু ভাঁজ করতে না পারো। এবারে ওই কাজগুলো তোমার কাছে কত কঠিন হয়ে যাবে। সারাজীবন এই অসুবিধাগুলির সঙ্গী হতে কে চায়? তবু অনেককে দুর্ঘটনা অথবা অসুস্থতার শিকার হয়ে এভাবে কাটাতে হয়।

পথে, ঘরে বা কর্মস্থলে দুর্ঘটনা থেকে বিশ্বের ৮ কোটি লোকের এই অবস্থা। রোগে পঙ্গু প্রায় ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ লোক। জন্মের সময়ে ত্রুটি বা ক্ষতির শিকার হয়ে অন্যান্যরা পঙ্গু। স্বাস্থ্যের অধিকতর যত্ন, পোলিওর মতো রোগের প্রতিষেধক নেওয়া, ঘরে, কল-কারখানায় বা কর্মস্থলে আরও ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ আমাদের হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈকল্য প্রতিহত করতে পারে। কেবল পোলিও রোগ থেকেই ভারতে অন্তত ৪০ শতাংশ লোক দৈহিক প্রতিবন্ধী। পোলিও-প্রতিরোধী ব্যবস্থা নিলে এমনটি হত না। ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের সময়মতো চিকিৎসা হলে জীবনভোর পঙ্গু হয়ে থাকতে হত না ওদের।

এই শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে। জড়বুদ্ধি হলে অবশ্য ভিন্ন কথা। কিন্তু ভুলবশত তাদের ক্ষতি করে তাদের পরিবার। মেলামেশা, পড়াশোনা, সব কিছু থেকে সরিয়ে কোণঠাসা করে ওদের রাখা হয় এই ভেবে যে, ওরা তো জীবনে কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু সবার সঙ্গে মেলামেশা করতে দিলে ওরাও ভাল ছাত্র আর যোগ্য সঙ্গী হতে পারে।

এই ধরনের পঙ্গুদের চলাফেরার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হলেও ওদের জন্য বিশেষ ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতে পারেন পরিবারের লোকজন অথবা বন্ধুরা। চলাফেরা, ট্রাম-বাসে ওঠা-নামা, বাথরুমে যাওয়া, মাটি থেকে কিছু তোলা—সবেতেই ওদের সাহায্যের প্রয়োজন। ইচ্ছে থাকলে তুমিও ওদের সাহায্য করতে পারো।

শুধু বন্ধু হয়েও ওদের সাহায্য করা যায়—কারণ ওরা খুবই নিঃসঙ্গ। সবাই ওদের এড়িয়ে চলতে চায়। ওদের সঙ্গে কিছু সময় কাটাও, নতুন-নতুন খেলায় মাতিয়ে তোলো। মনে রেখো, ওরাও মজা পেতে চায়।

মন ও মেধা

পিছিয়ে থাকা ছেলে-মেয়েদেরও তোমরা দেখেছ। ওরা স্কুলে যায়, কিন্তু ক্লাসের একেবারে নীচে পড়ে থাকে। লিখতে-পড়তে অথবা পড়া বুঝতে পারে না। ১২-১৩ বছর বয়সেও শিশুদের মতো আচার ব্যবহার। তোমরা যেটা নিমেষে বুঝছ, ওরা বুঝছে ছাড়া-ছাড়াভাবে, দেরিতে। বাড়ির লোকজনরাও ওদের পরিচয় দিতে লজ্জা পায়। জড়বুদ্ধি এদেরই বলে। এরা সারাক্ষণই বিব্রত, নিঃসঙ্গ, অন্যের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ; সবার তাচ্ছিল্যের পাত্র।

জড়বুদ্ধি ব্যক্তির বুদ্ধি তার বয়সের তুলনায় অস্বাভাবিক কম। বিশ্বে এরকম চার কোটি লোক আছে। ওদের সমস্যা অনুধাবন করে যদি উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তবে অধিকাংশই সুখী ও সার্থক জীবনযাপন করতে পারে।

জড়বোধ প্রতিরোধে অনেক কিছু করা যায়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দিয়ে শিশুকে ভূমিষ্ঠ করানো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মা ও শিশু উপযুক্ত পুষ্টি পেলে শিশুর মস্তিষ্কের কোষগুলি বহুগুণিত ও বিকশিত হওয়ার সময় প্রয়োজনীয় শক্তি পায়, এবং স্নায়ু-কোষগুলির মধ্যে সহজে সংযোগ ঘটে। প্রথম ১৮ মাসে পুষ্টির ঘাটতি হলে মস্তিষ্ক স্থায়িভাবে অবরুদ্ধ হয়ে যায়। ছেলেবেলায় ঘন ঘন ডায়ারিয়া হওয়াও বিপদের। শিশুর শরীর থেকে অত্যধিক তরল পদার্থ বেরিয়ে গেলে মাথার ক্ষতি হয়। শরীরে আয়োডিনের ঘাটতি থেকে গলগণ্ড দেখা দেয়। যে-সব পরিবারে এই রোগ পুরুষানুক্রমে চলে আসছে সে-সব পরিবারের শিশুদের জড়বুদ্ধি অথবা বোবা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে নুন আমরা খাই তার ভেতরের আয়োডিন গলগণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। এইসব বিপদ কমে গেলে জড়বুদ্ধিদের সংখ্যাও কমে আসবে। কিছু সংখ্যক অবশ্য থেকেই যাবে—অস্বাভাবিকতার কারণ নির্ণীত না-হওয়ার জন্যে। তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির সাধ্যমতো বিকাশের সুযোগ করে দিতে আমরা সমাজে তাদের জন্যেও স্থান তৈরি করব। অবশ্যই তাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, তবু তারা নিজেদের যত্ন নিতে ও ছোটখাট কাজ করতে তো পারবে।

জড়বুদ্ধি শিশুদের দরকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। জোর করে সারাক্ষণ নয়। নিজেদের জগৎ সহজেই তারা গড়ে তুলতে পারবে অভিভাবক, ভাই-বোন বা বন্ধুর সাহায্য ও উৎসাহ পেলে। ওদের ধরে ধরে শেখাতে হবে। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক শিশুদের মতো হওয়া ওদের পক্ষে দুঃসাধ্য, এই কথাটা মনে রেখেই আমরা ওদের শেখাব।

কীভাবে সাহায্য করব এদের? জড়বুদ্ধি শিশুদের সাহায্যের জন্যে বন্ধু চাই। তুমিও একজন বন্ধু হতে পারো। তোমার যদি ধৈর্য আর আন্তরিক আগ্রহ থাকে তুমি ওদের সাঁতার কাটা, সাইকেল চড়া, খেলতে নিয়ে যাওয়া, পড়া শেখানো—এই সব কাজে লাগতে পারো। ওরা যত শিখবে ততই ওদের খুশির ভাগ তুমিও নিতে পারবে।

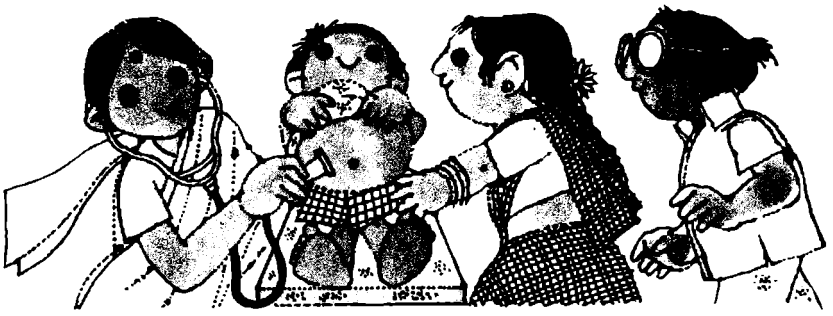

প্রতিরোধ অসম্ভব নয়

বিশ্বের প্রায় ৫০ কোটি প্রতিবন্ধী মানুষের মধ্যে ১২ কোটিই শিশু। সময়মতো ব্যবস্থা নিলে এই সংখ্যা এত ভয়াবহ হত না। একে অর্ধেকে নামিয়ে আনা যেত।

প্রতিরোধের বিজ্ঞানসম্মত অনেক সরল পন্থা আছে। অভিভাবকরা প্রায় নিখরচায় সেগুলি প্রয়োগ করতে পারেন। অক্ষমতা সৃষ্টিকারী রোগের প্রতিষেধক ইত্যাদি অন্যান্য ব্যবস্থা সরকারই করে থাকেন। অভিভাবকরা বর্তমান হেল্‌থ কেয়ার সার্ভিসগুলির পরিসেবা আরও বেশি কাজে লাগিয়ে এবং তাঁরা নিজেরা যেটা করতে পারেন তা শিখে নিয়ে শিশুদের রক্ষা করতে পারেন।

কোনো মহিলার সন্তান ধারণের সঙ্গে-সঙ্গেই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পুষ্টিকর পথ্য আবশ্যিক আর সংক্রমণ, দুর্ঘটনা বা অত্যধিক চাপ এড়িয়ে চলতে হবে।

শিশুর জন্মের পর মাতৃদুগ্ধই রোগ ও ঘাটতির স্বাভাবিক প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করে। চার মাসের পর খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তিত হতে থাকায় ও খিদে বেড়ে যাওয়ায় মায়ের দুধের সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্যই নরম খাবার দিতে হবে। পুষ্টি থেকে যে অক্ষমতা প্রতিরোধ করা সম্ভব সেটা বেশি করে মনে রাখা দরকার। আমাদের দেশে প্রধানত মা ও শিশুর অপুষ্টি থেকেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। ভাল পথ্য সবসময়েই ব্যয়সাধ্য নয়। সঠিক ব্যবহার জানলে শস্তা দেশি খাদ্যই প্রভূত পুষ্টি জোগাতে পারে।

উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া সমস্যা থেকে সৃষ্ট ত্রুটিগুলিকে আমরা সব ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করতে না-পারলেও, অস্বাভাবিকতাকে অনেকটা কমিয়ে আনতে পারি।

গোড়ায় ত্রুটি নির্ণয় করে চিকিৎসা করলে অনেক ক্ষেত্রেই অক্ষমতা শিশুকে গ্রাস করতে পারে না। ত্রুটি থেকে চিরস্থায়ী অক্ষমতা যাতে না-বর্তায় সে-জন্যে অনুকূল পরিবেশ, বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা ইত্যাদির সাহায্যে আমরা তাদের রক্ষা করে সুস্থ ও সুখী করে তুলতে পারি।

প্রতিরোধ সম্ভব অনেক পর্যায়ে। ঠিকমতো যত্ন নিলে প্রতিবন্ধকতা আদৌ দেখা দেবে না; দিলেও তার ক্ষতির মাত্রা অনেক হ্রাস পাবে।

আরেকটা পথ হল, তাদের অবজ্ঞা না-করে উৎসাহ দেওয়া। যতটুকু নিজের চেষ্টায় করতে পারছে তার জন্যে ওদের ভেতর গর্ববোধ জাগিয়ে তোলা। সুযোগ দিলে সামাজিক প্রতিবন্ধীদের সমস্যা সত্যিই অনেক কমিয়ে আনা যায়।

প্রতিবন্ধীদের প্রতি সম্মান

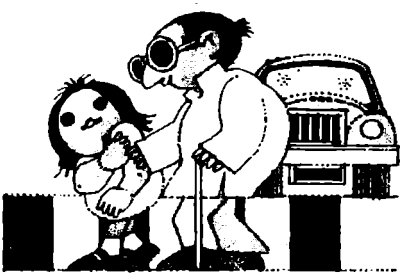

প্রতিবন্ধীদেরও নিজেদেরই একজন বলে ভাবতে শেখো। তাদের সম্মান দাও। আমাদের মতন ওদেরও আশা-আকাঙ্ক্ষা, শক্তি ও সীমাবদ্ধতা আছে। ওরাও সমাজের কাজে লাগতে চায়, করুণা অথবা দান চায় না। আত্ম-মর্যাদাবোধ ওদের কিছু কম নয়।

আমরা অনেকে বুঝে উঠতে পারি না কীভাবে ওদের সঙ্গে ব্যবহার করব। ওরাও নিজেদের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে প্রখর সচেতন থাকে বলেই অন্যদের ব্যবহার সম্পর্কে বেশ স্পর্শকাতর হয়। আমরা যদি ওদের মর্যাদা না-দিই, সেটা হবে ঘোর অবিচার। ওদের জীবনে তাহলে দুঃখই বেড়ে যাবে।

মনে রেখো, অক্ষমরাও স্ব-নির্ভর হতে চায়। প্রকৃত উৎসাহ দেখানোর অর্থই হল ওদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। তুমি হয়তো সাহায্য দিতে কুণ্ঠিত, ওরাও তেমনি সাহায্য চাইতে লজ্জা পেতে পারে। বাসের লাইনে, সিঁড়ির নীচে, জনাকীর্ণ রাস্তার ধারে কোনো প্রতিবন্ধীকে দেখে যদি তোমার মনে হয়, ওর সাহায্যের প্রয়োজন, সোজা এগিয়ে যাও, গিয়ে বলো। যদি সে প্রত্যাখ্যান করে, মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না।

প্রতিবন্ধীদেরও ক্ষমতা আছে; তারাও পারে তোমার সঙ্গে মিলে কিছু করতে, তোমাকে কিছু শেখাতে। তাদের পরিচয় এই নয় যে, তারা কানা, খোঁড়া, মূক-বধির। ওদের সঙ্গে মিলে কিছু করতে পারলে তুমি যেমন খুশি হবে, তেমনি ওরাও তোমাকে বন্ধু ভেবে কাছে টেনে নেবে।

প্রতিবন্ধীদের কষ্টের কথাটা ভেবে দেখ। ওই অবস্থায় তুমি কী করতে? কেমন লাগে, তোমার খুঁড়িয়ে চলার সময় যদি সবাই তোমাকে পিছে রেখে এগিয়ে যায়?

হাসি-ঠাট্টার পাত্র হতে কেউই চায় না। তবু কোনও সময় আমাদের সবাইকেই এমন অবস্থায় পড়তে হয় যখন মনে হয় সবাই আমাদের দিকে চেয়ে যেন হাসছে। আমরা যখন প্রতিবন্ধীদের নিয়ে ঠাট্টা করি, হাসি, সেই নির্দয়তার জন্যে কিন্তু একটুও লজ্জিত হই না।

চারপাশে তাকিয়ে দেখ, অধিকাংশ প্রতিবন্ধী শিশুকে কেমনভাবে পড়াশুনো, মেলামেশা, খেলাধুলো, উৎসব-আনন্দ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়ে থাকে। অভিভাবকরা বেশি শঙ্কিত হয়ে অথবা লজ্জার বশবর্তী হয়ে এই কাজ করেন। সমাজ ও প্রতিবেশীরা এই সমস্যা বাড়িয়ে তোলে তাদের ভয়, বিতৃষ্ণা, অসহিষ্ণুতা মিশিয়ে। রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ি তৈরির সময় শহরের স্থপতিরা ভুলে যান তাদেরকে যারা চলতে-ফিরতে, দেখতে অথবা বেয়ে উঠতে অক্ষম। তবু, আমরাই কিন্তু প্রতিবন্ধীদের সাহায্য করতে পারি সবচেয়ে বেশি।

প্রতিবন্ধীদের এই আন্তর্জাতিক বর্ষ আমাদের এ-কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, তাদের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম করে তারা প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে নিতে চলেছে। আমরা আমাদের মনোভাবের দ্বারা যেন আর তাদের প্রতিবন্ধী করেই রেখে না দিই। যেন তাদের পিছনে ঠেলে না রাখি।

ইউনিসেফ প্রচারিত এটি একটি তথ্যমূলক নিবন্ধ। এ-সম্পর্কে আরও জানতে হলে লেখো: ইউনিসেফ, ইনফরমেশন সার্ভিস (এ এম), ৭৩ লোদি এস্টেট, নয়াদিল্লি-১১০০০৩।

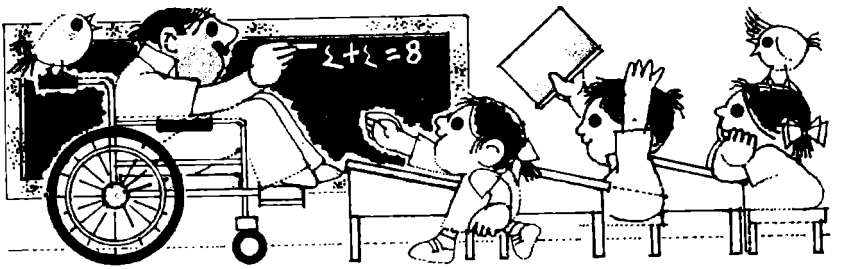

যাঁরা আসছেন

মণীশ মৌলিক

বব উইলিস

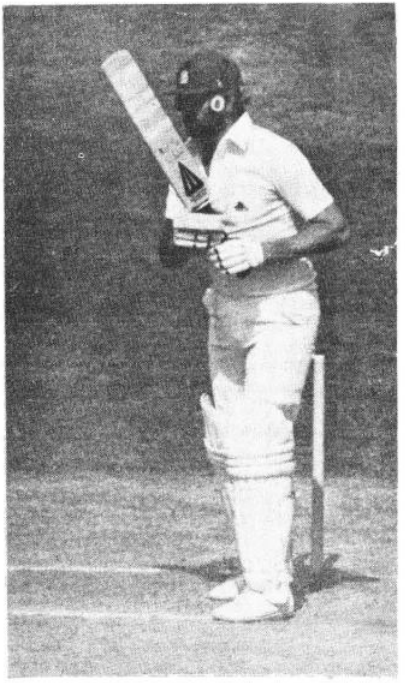

গ্রাহাম গুচ

এ-বছর শীতে ভারত ও শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য ইংল্যাণ্ড দলে নির্বাচিত ষোলোজন ক্রিকেটারের নাম সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচিত এই ষোলোজনের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে দুটি নতুন মুখ। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন নর্দাম্পটনশায়ারের অধিনায়ক জিওফ কুক এবং অপরজন সারের তরুণ উইকেট-রক্ষক জ্যাক রিচার্ডস। এঁরা ছাড়া দলের বাকি সবাই আগে টেস্ট ক্রিকেটে অংশ নিয়েছেন।

মনোনীত এই ষোলোজনের মধ্যে ব্যাটসম্যান আছেন সাতজন। এঁরা হলেন—কীথ ফ্লেচার (এবারে তিনিই ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক), জিওফ বয়কট, মাইক গ্যাটিং, গ্রাহাম গুচ, ডেভিড গাওয়ার, ক্রিস ট্যাভারে ও জিওফ কুক। দলে স্বীকৃত অল-রাউণ্ডার রয়েছেন একজন—ইয়ান বথাম। এক নম্বর উইকেট-রক্ষক হিসেবে অর্ন্তভুক্ত হয়েছেন বব টেলর। তরুণ জ্যাক রিচার্ডসকে দু নম্বর উইকেট-কীপার হিসেবে রাখা হয়েছে। দলে দ্রুতগতির বোলারের সংখ্যা চার। গতির আক্রমণের চার সৈনিক হলেন—বব উইলিস, পল অ্যালট, গ্রাহাম ডিলি ও জন লেভার। এছাড়া জন এমবুরি ও ডেরেক আণ্ডারউডকে স্পিনার হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছে।

এমবুরি ও আণ্ডারউড ছাড়া আর একজন স্পিনারের বদলে একজন ব্যাটসম্যানকে দলে নেওয়ার ফলে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। এ-ব্যাপারে নির্বাচকমণ্ডলী কীথ ফ্লেচারের মতামতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ফ্লেচারের মতে, তাঁর গত ভারত সফরের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এই সফরে তৃতীয় স্পিনারের খুব একটা প্রয়োজন হবে না। ফলে তৃতীয় স্পিনারের জায়গায় একজন ব্যাটসম্যানকে নেওয়া হয়েছে।

ডেভিড কুক গত ৫ সেপ্টেম্বর ন্যাট-ওয়েস্ট ট্রফির সীমিত ওভারের ফাইনালে একটি চমৎকার শতরান করে নির্বাচকদের তাঁর

সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করেছিলেন। তাঁর অন্তর্ভুক্তির ফলে ওয়েন লারকিন্সকে বাদ পড়তে হল। দ্বিতীয় উইকেট-রক্ষক জ্যাক রিচার্ডসের নির্বাচন প্রায় অপ্রত্যাশিত বলা চলে। বোধহয় রিচার্ডসের ব্যাটিং-দক্ষতার কথা মনে রেখেই তাঁকে দলে নেওয়া হয়েছে। বেশ কিছুদিন পরে আণ্ডারউড আবার টেস্ট খেলবেন। ছত্রিশ বছর বয়সী এই ন্যাটা স্পিনারের পক্ষে এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। কারণ ৩০৯টি উইকেট সংগ্রহের রেকর্ড স্পর্শ করতে হলে তাঁকে আরও একত্রিশটি উইকেট পেতে হবে। ছটি টেস্টের এই সিরিজে তাঁর পক্ষে তা হয়তো সম্ভব হবে;মনে হয়, এইরকম কিছু ভেবেই তাঁকে দলে নেওয়া হয়েছে। রেকর্ড ভাঙার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন আরও একজন—জিওফ বয়কট। গারফিল্ড সোবার্সের তৈরি সর্বোচ্চ রান সংগ্রহের রেকর্ড ছুঁতে বয়কটের আর অল্প বাকি আছে। আমাদের সকলের প্রার্থনা, বয়কট এখানেই নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেলুন। বয়কট ও আণ্ডারউড থাকলেও সফরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ নিঃসন্দেহে ইয়ান বথাম।

বিগত অসট্রেলিয়া – ইংল্যাণ্ড সিরিজে বথাম প্রায় একাই যে-ভাবে অসট্রেলিয়াকে নাস্তানাবুদ করেছেন, তাতে এটা বলা ভুল হবে না যে, বথামকে নিয়ে ভারতের বেশ দুশ্চিন্তা থাকবে।

গ্রাহাম ডিলি ভারত সফরের জন্য নির্বাচিত হবেন কি না, এ-ব্যাপারে অনেকের মনেই সংশয় ছিল। কারণ, অসট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে ডিলি কাঁধে চোট পেয়েছিলেন এবং তারপর থেকে তিনি মোটেই ভাল খেলতে পারছেন না। তবু ডিলিকে ষোলোজনের মধ্যে রাখা হয়েছে। কারণ, নির্বাচকদের মতে, দলে ওঁর মতো বোলারের প্রয়োজন আছে। তাছাড়া, ব্যাটিংয়েও ওঁর বেশ হাত।

দলে ক্রিস ওল্ড এবং মাইক হেনড্রিকের থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁরা দুজনেই বাদ পড়েছেন। তাঁদের জায়গায় এসেছেন টেস্টে নতুন অভিষিক্ত পল অ্যালট এবং বাঁ-হাতি জন লেভার। পল অ্যালট এই প্রথম ভারতে আসছেন। লেভার কিন্তু আগে এসেছিলেন।

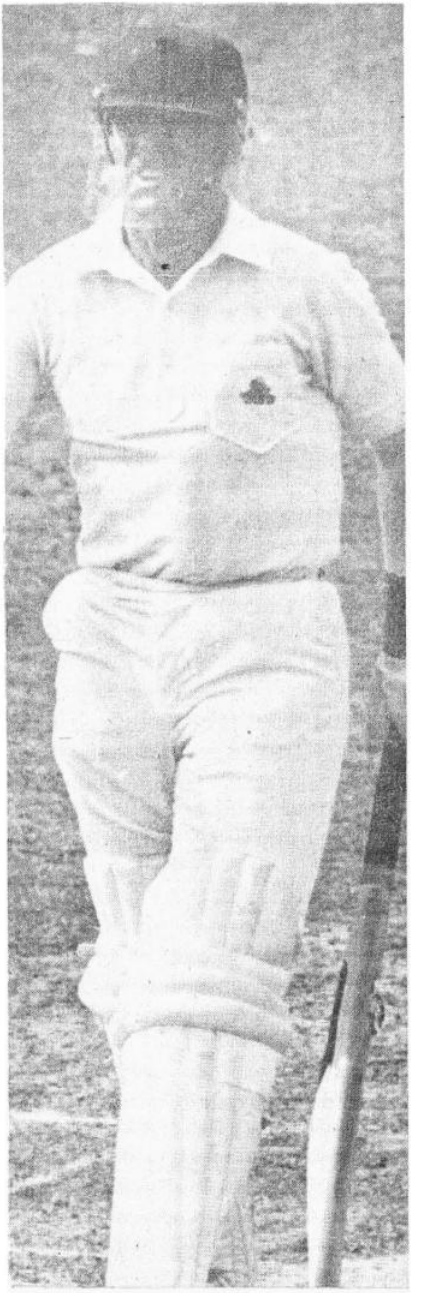

জিওফ বয়কট

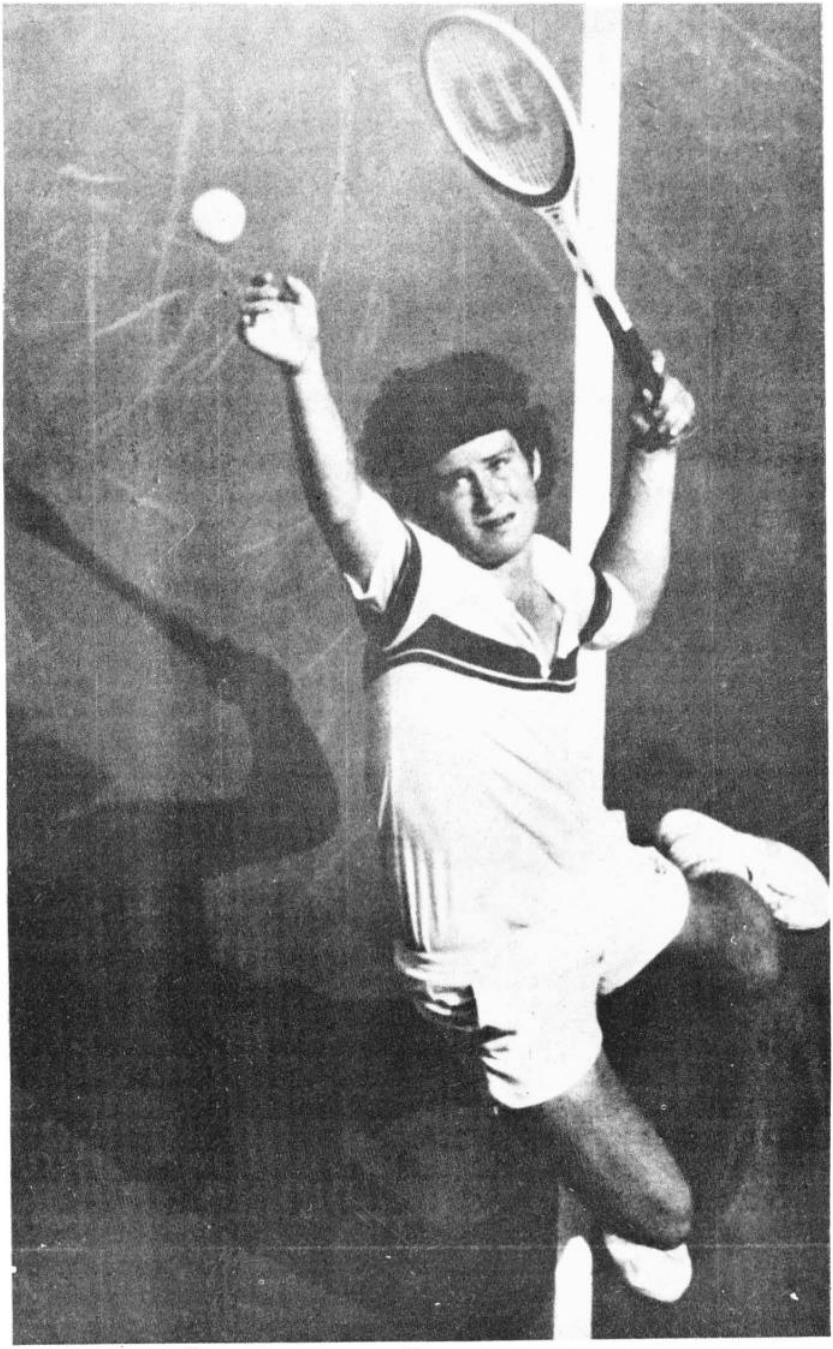

ম্যাকেনরোর প্রচণ্ড সার্ভিস···

আবার ম্যাকেনরো

ডেভিড ম্যাকম্যাহন

কী অবাক কাণ্ড! মাত্র কিছুদিন আগে যে-ম্যাকেনরো চার সেটের খেলায় বর্গের কাছ থেকে উইম্বলডন-মুকুট ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, ইউ এস ওপেনে তিনিই আবার বর্গকে হারালেন একই ফলাফলে। আরও বিস্ময় এই যে, উইম্বলডনে প্রথম সেট জিতেও বর্গ পরের সেট তিনটি পর-পর তুলে দিয়েছিলেন ম্যাকেনরোর হাতে; ইউ এস ওপেনেও ঠিক তাই হল।

এ-বছরের জন্য টেনিসের গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম হাত ফসকে গেলেও উইম্বলডন আর ইউ এস ওপেন জেতার সুবাদে চারটি খেতাবের মধ্যে দুটি ম্যাকেনরোর হাতের মুঠোয়। পেশাদারি টেনিসের চার প্রধান প্রতিযোগিতার প্রথমটিতে—অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ ওপেনে বর্গ জিতেছেন ঠিকই, কিন্তু বছরের শেষে অসট্রেলিয়ান ওপেনে অঘটন না ঘটলে হয়তো দুই খেলোয়াড়ের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। জন ম্যাকেনরো উঠেপড়ে প্রমাণ করতে চাইবেন, তিনি আর বর্গের ছায়ায় আবৃত নন; আর বিয়র্ন বর্গও নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সেই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবেন না।

ইউ এস ওপেনে সেমি ফাইনালে পঞ্চদশ-বাছাই ভিটাস গেরুলাইটিসের মুখোমুখি হবার আগে পর্যন্ত ম্যাকেনরো প্রায় হেলায় হারিয়েছেন অল্পখ্যাত খেলোয়াড়দের। অবশ্য ভারতের রমেশ কৃষ্ণন কোয়ার্টার-ফাইনালে তাঁর কাছ থেকে প্রথম সেটটি জিতে সাড়া জাগিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি শেষরক্ষা করতে পারেননি। স্বদেশীয় গেরুলাইটিস সেমিফাইনালে ম্যাকেনরোকে বিলক্ষণ বেগ দিয়েছিলেন, শেষমেশ অবশ্য পাঁচ সেটের পরীক্ষায় ম্যাকেনরো কোনোরকমে উতরে যান।

মেয়েদের বিভাগে নাভ্রাতিলোভাকে হারিয়ে ট্রেসি অস্টিন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ইউ এস ওপেনে ১৯৭৯ সালটিও ছিল ম্যাকেনরো আর অস্টিনের বছর। সেবার ষোড়শী কিশোরী অস্টিনের এক হাতে ধরা ছিল 'টেডি বেয়ার' অর্থাৎ খেলনা-ভালুক, অন্য হাতে ট্রফি। এবার তাঁকে সাজসজ্জায় সাবালিকা মনে হয়েছে, কারণ হাতে সেই 'টেডি বেয়ার' ছিল না। তার বদলে জয়ের ইচ্ছেটা ছিল প্রবল। কারণ উইম্বলডনের কোয়ার্টার-ফাইনালে শ্রিভারের কাছে হেরে যাওয়ার পর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে একটা বড় জয়ের প্রয়োজন ছিল তাঁর।

প্রতিযোগিতার গোড়ার দিকেই

...ফেরানো সহজ হয়নি বর্গের পক্ষে

চেকোশ্লোভাকিয়ার বিস্ময়বালিকা হানা মাণ্ডলিকোভার পরাজয় অনেকের কাছেই অভাবনীয় ছিল। নাভ্রাতিলোভার কাছে ক্রিস লয়েডের পরাজয়ও প্রত্যাশিত নয়। নাভ্রাতিলোভা এবার উইম্বলডনে ভাল ফর্মে ছিলেন না, ইউ এস ওপেনে কিন্তু দারুণ খেলছিলেন তিনি। তাই ফাইনালে অস্টিনের কাছে হার তাঁর পক্ষে বেদনাদায়ক—বিশেষ করে ভাল খেলে প্রথম সেটটি যখন তিনি জিতে ফেলেছিলেন। পর-পর দুবার উইম্বলডন-বিজয়িনী নাভ্রাতিলোভা তাঁর আগের ফর্ম ফিরে পাবার বৃথা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অস্টিনের বিরুদ্ধে ফাইনালে জিততে পারলে সেই চেষ্টা আবার সাফল্যের মুখ দেখত। কিন্তু বেচারা নাভ্রাতিলোভা! গ্র্যাণ্ড শ্লাম. টেনিসের শেষ প্রতিযোগিতা অসট্রেলিয়ান ওপেন পর্যন্ত এখন আবার তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে—শীর্ষসম্মান যদি জোটে।

চেক টেনিস-প্রতিভা তৃতীয়-বাছাই ইভান লেণ্ডলও ইউ এস ওপেনে আশা জাগাতে পারেননি। উইম্বলডনে তিনি প্রথম রাউণ্ডেই হেরে যান। এবারও গেরুলাইটিসের কাছে এই পরিশ্রমী খেলোয়াড়টির পরাজয় ঘটে। মনে হয়, অত্যধিক টেনিস খেলার ধকল তাঁর ক্ষতি করতে শুরু করেছে। শীর্ষবাছাই পেশাদার টেনিস-খেলোয়াড়দের মধ্যে ইদানীং তিনিই সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন। কিন্তু লেণ্ডল উঁচুদরের খেলোয়াড়, সাময়িক অসাফল্যে তিনি ভেঙে পড়েন না। আপাতত তাঁকে উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে—আবার তিনি জ্বলে উঠবেন ঠিকই।

আর ম্যাকেনরো তো প্রমাণ করেই দিলেন, তিনিই বছরের সেরা টেনিস-খেলোয়াড়। তাঁর শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে খুব বেশি মানুষ আপত্তি জানাবেন না। উইম্বলডনে তিনি বর্গের একটানা দিগ্বিজয়ে ছেদ টেনেছেন, ইউ এস ওপেনে একাধিপত্য বিস্তার করছেন এবং খেলার ভিতর দিয়ে প্রমাণ করতে শুরু করেছেন যে, নিজের মুখফোঁড় স্বভাবটা পালটাতে পারলে অতুলনীয় বর্গের যোগ্য উত্তরাধিকারী তিনিই হবেন, আর-কেউ নয়।

খেলার মাঠ

খেলাটা আসলে খেলা নয়, পড়াও বটে। সেটা জান তো? খেলার মাঠে ছোটবেলা থেকে আমরা যেটা শিখি সেই 'ডিসিপ্লিন' বা নিয়মানুবর্ত্তিতা আমাদের সারা জীবনেই খুব কাজে আসে।

আমরা খেলতে গিয়ে শিখি সময় ও সুযোগের অপেক্ষা ও ব্যবহার। সেই শিক্ষা আমরা খেলার মাঠের বাইরে বাসের জন্য "কিউ" দেবার সময় প্রয়োগ করতে পারি। দলপতি বা দলনেতার আদেশ শিরোধার্য করার যে ধৈর্য্য ও ক্ষমতা আমরা খেলার মাঠে দেখতে পাই সেটা আমাদের জীবনের ক্ষেত্রেও এক সংযম এনে দিতে পারে।

সেইজন্যই বারবার মনে হয় আমাদের খেলাটা আসলে শেখা। তবে এই বিষয়টা নিয়ে আজ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো এই যে সে কথাটা আমরা আজ ভুলতে বসেছি। খেলার আসরে খেলোয়াড় ছাড়া দর্শক হিসেবেও যে এই সব শিক্ষা আমাদের কাজে লাগানো উচিত ব্য কর্ত্তব্য সে কথা আজ আর ক'জনেরই বা মনে থাকে? অথচ খেলাধূলো তো আমরা প্রত্যেকেই করেছি। কেউ হয়তো বল, হাডুডু, আর কেউ হয়তো ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, ক্রিকেট। এই যা তফাৎ।

কথাগুলো আমাদের আজকে ভেবে দেখা জরুরী। তোমরা কি বল?

(জনসংযোগ বিভাগ সি. এম. ডি. এ, ৩এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭, হ'তে প্রচারিত)

চন্দনকাঠের বাক্স

অনীশ দেব

কাল রাতে মাকে আবার স্বপ্নে দেখল সুমন।

ধূপের ধোঁয়ায় সব আবছা হয়ে গেছে। সাদা চন্দনের গন্ধে ভরে গেছে চারদিক। তারই ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল মায়ের সুন্দর মুখটা। কপালে সিঁদুরের বড় টিপ, ফর্সা মুখে গোলাপি আভা। নাকে নাকছাবি। চোখ ও ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি। কালো, সবুজ আর সাদায় কাজ-করা চওড়া-পাড় একটা শাড়িতে ঘোমটা দিয়ে রয়েছে মা। সুমনকে যেন বলছে, "দুষ্টুমি কোরো না, বাবা। মন দিয়ে লেখাপড়া করো। অনেক বড় হতে হবে তোমাকে।"

ভোরবেলা কাকের ডাকে ঘুম ভাঙল সুমনের। মাথার কাছে ছোট্ট জানলা দিয়ে ভোরের নরম রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। জানলার পাল্লায় বসে একটা কাক থেকে থেকে ডাকছে। রোজই এই কাকটা এসে ওর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। আর সুমন জেগে উঠলেই ওটা উড়ে যায় হয়তো অন্য কারো ঘুম ভাঙাতে।

বিছানায় কিছুক্ষণ চোখ মেলে শুয়ে রইল সুমন। স্বপ্নের ছবিটা ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এখনও। এতটুকু ঝাপসা হয়নি। এই একই স্বপ্ন ও যে কতদিন ধরে দেখে আসছে মনে নেই। ইস্কুলের বন্ধুদের স্বপ্নের কথাটা শোনালে অলক বলেছিল, "তোর কথা এতটুকু বিশ্বাস করি না। আমার ছোটকাকু বলে, স্বপ্নে কখনও রঙ দেখা যায় না, গন্ধ পাওয়া যায় না। আর তুই কী করে ধূপের গন্ধ পেলি? চন্দনের গন্ধ পেলি? শাড়ির রঙ দেখলি?"

অন্যান্য বন্ধুরাও একই সঙ্গে অলকের দলে হয়ে সুমনকে কোণঠাসা করতে চেয়েছে। কিছুক্ষণ প্রতিবাদ করেছে সুমন। তারপর অত বড় দলের সঙ্গে আর পেরে ওঠেনি। ভীষণ কান্না পেয়েছে ওর। মনে মনে মাকে ডেকে বলেছে, মা, মাগো, তুমি তো একবার এসে ওদের বলতে পারতে আমি সত্যি কথা বলছি! তারপর থেকে আর কোনোদিনও স্বপ্নের কথা কাউকে বলেনি।

সেদিন থেকে চুপচাপ হয়ে গেছে সুমন। ক্লাসে বন্ধুদের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা আর বলে না। পড়ার সময় পড়া করে, অন্য সময় মায়ের কথা ভাবে। বুকটা কেমন আনন্দে ভরে যায় ওর।

বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল সুমন। বাবা আগেই উঠে পড়েছেন। সাড়ে-সাতটার মধ্যে বাবা তৈরি হয়ে মেঝেতে মাদুর পেতে বসে পড়েন। অপেক্ষা করেন ছাত্রদের জন্য। সকালে

অরূপ, বিকাশ আর দেবাশিস—এই তিনজন পড়তে আসে বাবার কাছে। ওদের বাড়ি খুব দূরে নয়। বাবার কাছে ওরা পড়ছে আজ প্রায় তিন বছর ধরে। অরূপ আর দেবাশিস অন্য ইস্কুলে ক্লাস টেন-এ পড়ে। বিকাশ সুমনের ইস্কুলেই পড়ে। ক্লাস নাইনে। সুমনের চেয়ে এক ক্লাস নিচুতে।

হাত-মুখ ধুয়ে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল সুমন। বাবা পুরু কাচের চশমা চোখে দিয়ে ঝুঁকে বসে একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছেন। বাবা চোখে ভীষণ কম দেখেন। তবে এদিকে চোখ না ফেরালেও বাবা জানেন সুমন এখন কী করবে। সেটা সুমনের রোজকার কাজ।

রঙ-ওঠা নীলচে-সাদা দেওয়ালে ছবিটা টাঙানো রয়েছে। একদিন হয়তো ছবির সবকটা রঙ উজ্জ্বল ছিল। কারুকাজ-করা ফ্রেমের রঙ ছিল ঝকঝকে সোনার মতো। কিন্তু আজ, সময়ের স্রোতে, কারুকাজ-করা ফ্রেম মলিন হয়ে গেছে। ছবির রঙ হয়ে এসেছে ফ্যাকাশে। তা সত্ত্বেও সুমন যেন রোজ ছবিটাকে নতুনের মতোই দেখতে পায়। জ্ঞান হওয়া থেকেই ও একই রকম দেখে আসছে। স্বপ্নে ঠিক যেরকমটা দেখে।

ছবির কাচটা বাবা রোজ ঘষে ঘষে পরিষ্কার করেন। দুটো চন্দন-ধূপ জ্বেলে গুঁজে দেন ফ্রেমের কোণে। আর নয়নতারা ফুলের মালা গেঁথে পরিয়ে দেন। এই ফুল আসে ওদের সদর দরজার পাশে রাখা দুটো টবের নয়নতারা গাছ থেকে। বাবার মুখে সুমন শুনেছে, মা নাকি এই ফুল খুব পছন্দ করতেন। পছন্দের একটা কারণ সুমন বাবার কাছ থেকে জেনেছে, মায়ের নামের সঙ্গে এই ফুলের নামের মিল আছে।

ছবির নীচেই লেখা রয়েছে মায়ের নাম : শ্রীমতী নয়নকণা রায়। এই নামটা রোজই মনে মনে গুনগুন করে সুমন। কী সুন্দর নাম! নাম থেকে শুরু করে ছবির প্রতিটি অংশ ওর ভীষণ ভাল লাগে। ইশ, মা যদি বেঁচে থাকতেন! ভাবে সুমন। ওর দু'বছর বয়েসে মা মারা গেছেন। বাবাই বলেছেন। তাহলে মায়ের সত্যিকারের মুখটা কেন সুমনের মনে পড়ে না? ভাবতে গেলেই কেন এই ছবির মুখটা খালি ভেসে ওঠে? বাবাকে প্রশ্ন করলে বাবা হেসে বলেন, "দু বছর বয়েসের কথা কি কারও মনে থাকে রে! তবে তোর মা হুবহু এই ছবিটার মতো ছিল।"

বাড়িতে মায়ের আর কোনো ছবি নেই। বাবার কাছেও না। এর কারণ বাবাকে জিজ্ঞেস করলে বাবা উত্তর দেন না। চুপ করে থাকেন।

ধূপের ভারী ধোঁয়ায় গভীর করে শ্বাস নিল সুমন। ছবির দিকে তাকিয়ে চোখ ঝাপসা হয়ে এল। হাত জোড় করে চোখ বুজল ও। তারপর চোখ খুলে ধীরে ধীরে তাকাল ছবির ঠিক নীচে একটা টুলের ওপর রাখা জিনিসটার দিকে।

খুব সুন্দর কারুকাজ-করা একটা ছোট্ট চন্দন কাঠের বাক্স।

বাক্সটা সেই ছোট্টবেলা থেকে এই একই জায়গায় দেখে আসছে সুমন। ডালা বন্ধ। তাতে ছোট্ট একটা তালা লাগানো। কৌতূহল ওর প্রথম দিনেই হয়েছিল। ফলে বাবাকে সোজা গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "বাবা, ঐ ছোট্ট বাক্সটায় কী আছে?"

তখন সুমন ক্লাস থ্রীতে পড়ত। ওর বড়-বড় চোখের দিকে তাকিয়ে বাবা বলেছিলেন, "আগে বড় হও, তারপর জানতে পারবে।"

অবাক হলেও আর কিছু বলেনি ও। তবে সুমন মাঝে-মাঝে মায়ের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেছে, "মা, মা-মণি, এই বাক্সটায় কী আছে?"

মায়ের ছবি কোনো উত্তর দেয়নি। শুধু হেসেছে।

বুকের ভেতর কৌতূহল নিয়ে আরও তিন বছর কাটিয়ে দিয়েছে সুমন। তারপর আর থাকতে পারেনি। একদিন তালাটা ধরে চুপিচুপি টেনে দেখেছে। না, খোলেনি ছোট্ট তালাটা। তখন বাবাকে গিয়ে বলেছে, "বাবা, এবার বলো। এখন তো আমি বড় হয়েছি—"

বাবা বিছানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ঘুরে তাকিয়ে চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে ভাল করে দেখলেন সুমনকে। ক্লাস সিক্সের ছেলেটা ঘাড় বাঁকিয়ে সামান্য জেদি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। হাতের কাগজটা নামিয়ে রেখে বাবা ওকে ডাকলেন কাছে। বললেন, "আয়, এখানে আয়।"

সুমন আস্তে আস্তে কাছে গেল। বসল বাবার পাশে। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বাবা বললেন, "খোকা, তুই-ই তো আমার সব। এ-সংসারে আমার আর কেউ নেই।"

বাবা কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন। শীর্ণ হাতে ওকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে রূপকথার মতো করে শোনালেন ওই বাক্সের গল্প। "তোর মা বিয়ের সময় পেয়েছিলেন ওই চন্দন কাঠের বাক্সটা, তোর দিদিমার কাছ থেকে। ওঁদের পরিবারে রীতি ছিল, সবচেয়ে প্রিয় আর দামি জিনিসই ওই বাক্সে রাখা হবে। বিয়ের পর তোর মা সমস্ত গয়নাগাঁটি রেখেছিলেন ঐ বাক্সে। আমি তখন ইস্কুলে মাস্টারি করি। এরপর তোর জন্ম হল। বেশ কিছুদিন হৈ-হৈ করে খুশিতে কাটল। তারপরই এক ভয়ংকর ঘটনা বোবা করে দিল আমাকে। তোর মা পেটে ব্যথা নিয়ে ভর্তি হল হাসপাতালে। পরীক্ষা করে ডাক্তার বলল, অপারেশন করা দরকার। অপারেশন করতে গিয়ে দেখা গেল পেটের ভেতরটা ক্যান্সারে শেষ হয়ে গেছে। ডাক্তার বলল, কোনো আশা নেই। এভাবেই যতদিন বাঁচে। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম রে তোর মাকে বাঁচাতে, কিন্তু পারিনি। তোর মা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে। তাই একদিন তোকে দেখতে চেয়েছেন, বলেছেন, সুমনকে নিয়ে এসো। আর চন্দন কাঠের বাক্সটাও নিয়ে আসবে, দরকার আছে···।"

বাবা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। হয়তো বৃষ্টি হবে। সুমনের পিঠে হাত রেখে বাবা বললেন, "অবাক হলেও তোর মায়ের অনুরোধ আমি রেখেছিলাম। তোকে কোলে নিয়ে শেষ দেখা দেখতে গেলাম তাকে। আমাকে লুকিয়ে বাক্সটা নিয়ে কী যেন করল তোর মা। তারপর সেটা নিয়ে আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, এটা রেখে দাও। আর, এই নাও চাবি। সুমনের যেদিন পনেরো বছর পূর্ণ হবে, সেদিন চাবিটা দেবে ওর হাতে। তার আগে নয়। তুমি কথা দাও আমাকে।"

মন্ত্রমুগ্ধ সুমনের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "আমি কথা দিয়েছিলাম রে···।"

সুমন আন্দাজ করে বলল, "বাক্সে কি তাহলে গয়না আছে?"

দুঃখের হাসি হেসে বাবা বললেন, "না রে বোকা। সেগুলো তোর মা আলাদা করে আমার কাছে দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, তোর লেখাপড়ার জন্য, তোকে মানুষ করার জন্য সেগুলো যেন আমি কাজে লাগাই।"

"তাহলে কী আছে ঐ বাক্সে?" সুমন আগ্রহের চোখে তাকাল বাবার মুখের দিকে।

"আমি জানি না। সময় হলে চাবিটা তোকে দেব। তখন তুই নিজেই খুলে দেখিস।"

সুমন তখন খুশির গলায় বলল, "নিশ্চয়ই খুব প্রিয় আর দামি জিনিস আছে, না বাবা? তাই তো রাখার নিয়ম ছিল ওই বাক্সে?"

উদাস স্বরে বাবা বললেন, "হবে হয়তো।"

এরপর আরও বড় হয়ে উঠতে লাগল সুমন। ক্লাসের পর ক্লাস ডিঙিয়ে উঠতে লাগল ওপরে। আর একই সঙ্গে মাকে স্বপ্নে দেখতে শুরু করল। প্রায়ই। তখন একদিন রাতে খেতে বসে হঠাৎই স্বপ্নের কথাটা বাবাকে বলল ও। বাবা খাওয়া থামিয়ে তাকালেন। বললেন, "তোর মা তোকে ভীষণ ভালবাসত। তোকে ছেড়ে মোটেই যেতে চায়নি। কিন্তু কঠিন অসুখ···রাখা গেল না। সেই জন্যেই বোধহয় অমন স্বপ্নে ফিরে আসে। তোকে নিয়ে অনেক আশা ছিল তো—।"

সুমনের মনটা ব্যথায় মুচড়ে উঠল। বাবা অনেকদিন রিটায়ার করেছেন ইস্কুলের চাকরি থেকে। চোখে ভাল দেখতে পান না, তাই সময়ের আগেই রিটায়ার করতে হয়েছে। সারাদিন বাড়িতে থেকে সব কাজ করেন, আর সময় করে সুমনের পড়া দেখিয়ে দেন রোজ। সুমনের লেখাপড়া যে কত কষ্টে চলে তা ও খুব ভালভাবেই জানে। মায়ের অভাব বাবা যে বুঝতে দিতে চান না।

এই বছর ক্লাস টেন-এ উঠে সুমন আর থাকতে পারেনি। বাবাকে গিয়ে বলেছে, "বাবা, আমার বয়েস এখনও পনেরো হয়নি?"

দেওয়ালে টাঙানো পুরনো ক্যালেণ্ডারের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন বাবা। চোখ কুঁচকে তারিখ দেখে বলেছেন, "এখনও প্রায় ছ'মাস বাকি রে।"

ওর জন্মদিন কবে সুমন জানে না। বাড়িতে ওর জন্মদিনের উৎসব কিছু হয় না। হয়তো সেই উৎসবও শুরু হবে ওর পনেরো বছর পূর্ণ হবার পর। যেদিন খোলা হবে ওই চন্দন কাঠের বাক্স। সুমন সেদিন জিজ্ঞেস করেছে বাবাকে, "আমার জন্মদিন কবে, বাবা?"

"সাতই জুলাই।" উত্তর শুনে সুমনের মনটা একটু দমে গেছে। তবু ভেবেছে, আর তো মাত্র

ছ'টা মাস! দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

আজ সেই দিন এসেছে। ছয় জুলাই। সুমন যেন সুস্থির হয়ে কোনো কাজ করতে পারছে না। স্নান-পড়া-খাওয়া সবকিছুতেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। বাবা সব-কিছু লক্ষ করলেও নিজের কাজ নিয়মমতো করে গেছেন। মনের বিচলিত ভাব বুঝতে দেননি।

আনমনা হয়ে ইস্কুল থেকে ফিরে এল সুমন। চুপচাপ বসে রইল বাড়িতে। ইশ, আর একটা মাত্র দিন! তারপরই ওর পনেরো বছর পূর্ণ হবে! ও জানতে পারবে ওই চন্দন কাঠের বাক্সে মা ওর জন্য কী অমূল্য জিনিস রেখেগেছেন। আজকের রাতটা পেরোলেই—

রাতে স্বপ্নে মা আবার এলেন। যেন হাসিমুখে আশীর্বাদ করলেন সুমনকে, "অনেক বড় হ', খোকা। তোর বাবা যে তোর মুখ চেয়ে আছে।" তারপর ধূপের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে ও যেন দেখল, একটা ছোট্ট চাবি কোথা থেকে এসে গেছে ওর হাতে। সুমন আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে বাক্সটার দিকে। ওটা খুলে এবার দেখবে ও। অপেক্ষা শেষ হবে।

যেখানেই যান, যে-কাজই করুন
স্বাচ্ছন্দ্যময় চলা-হাঁটার উপরই
নির্ভর করছে আপনার সাফল্য।

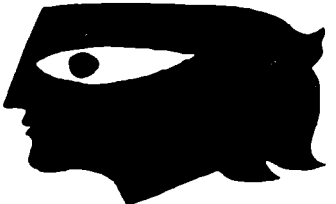

রাজুর তৈরী টেকসই গেঞ্জী,জাঙ্গিয়া,
মোজাই আপনাকে জোগাতে পারে
সেই বাড়তি স্বাচ্ছন্দ্য, এবং কম
খরচে। কেনার সময় খোঁজ করবেন-

১। প্রেসটিজ রঙীন জাঙিয়া
২। রঙীন ড্রয়ার্স
৩। ডাক্কর জাঙিয়া
৪। ফেদার-ফিট রিব গেঞ্জী
৫। ইজিপসিয়ান গেঞ্জী
৬। কুলফিল গেঞ্জী

গেঞ্জী জাঙ্গিয়া
মোজার রাজা

RAJU

এমন সময় ঘুমটা ভেঙে গেল সুমনের। বাবা ওকে ডাকছেন,"সুমন, সুমন ওঠ, ভোর হয়ে গেছে—"

ঘুম-চোখ মেলে তাকাল সুমন। পুবের আকাশ সবে ফর্সা হয়ে এসেছে। কাকটা এখনো আসেনি ওর ঘুম ভাঙাতে। ও আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। বাবা বললেন, "যা স্নান করে আয়। নতুন জামা-প্যান্ট বের করে রাখছি। এসে পরবি। আজ যে তোর জন্মদিন!"

আঙুল দিয়ে চোখ ঘষে ও বলল, "আমার বয়স আজ পনেরো পুরো হল,, তাই না, বাবা?"

"হ্যাঁ। এখন যা, চটপট স্নান সেরে নে।"।

নতুন জামা-প্যান্ট বাবা কবে কখন কিনে এনেছেন সুমন টের পায়নি। স্নান করে এসে দেখল ঘরের গোটা ছবিটাই পালটে গেছে। সারা ঘরময় ঘন ধূপের গন্ধ, মিষ্টি ধোঁয়া। এক ঝাঁক নয়নতারা ফুলের মালা মায়ের গলায় পরানো। চন্দনের ফোঁটা আর সিঁদুরের টিপ দিয়ে কত দরদ দিয়ে বাবা সাজিয়েছেন মাকে। আর একটা ছোট্ট পেতলের চাবি রাখা রয়েছে টুলের ওপর। চন্দন কাঠের বাক্সটার ঠিক সামনে।

নতুন পোশাকে বাবার হাত ধরে মায়ের ছবির সামনে এসে দাঁড়াল সুমন। বাবা মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় বললেন, "তোমার চলে যাওয়ার দুঃখ সইতে না পেরে সব ছবি আমি নষ্ট করে ফেলেছিলাম। শুধু এইটা পারিনি খোকার মুখ চেয়ে। তাহলে ও যে আমাকে কোনোদিন ক্ষমা করত না।"

বাবার চোখে জল এসে গেছে। শীর্ণ গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুরেখা। সুমনের মাথায় হাত রেখে মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, "তোমার কথামতো আজ এই বাক্সের চাবি আমি তুলে দিচ্ছি খোকার হাতে। তোমার প্রিয় দামি জিনিস তুমি নিজের হাতে ওকে দাও।"

সুমনের দিকে ফিরে বাবা বললেন, "বাক্স খোল। দ্যাখ, তোর মা তোর জন্য কী রেখে গেছে।"

সুমনের হাত-পা কাঁপছে। বুক দুরু-দুরু। গায়ে যেন কাঁটা দিচ্ছে। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে চাবিটা তুলে নিল ও। হাত জোড় করে নমস্কার করল মাকে। তারপর গুপ্তধনের সিন্দুক খোলার মতো রোমাঞ্চ অনুভব করে বাক্সের

তালা খুলে ফেলল। ধূপের ভারী ধোঁয়া সরে গিয়ে দৃষ্টি পরিষ্কার হল। ও দেখল, সেই বাক্সের ভেতরে নীল মখমলের ওপর একটা বিবর্ণ হলুদ কাগজ। কাঁপা হাতে সেটা তুলে নিল সুমন। তারপর ধীরে ধীরে ভাঁজ খুলল। কিছু কাগজের টুকরো ভেঙে ঝরে গেল মেঝেতে। অতি সাবধানে কাগজটা মেলে ধরতে বিবর্ণ-তামাটে লেখাগুলো নজরে পড়ল সুমনের। সুন্দর অক্ষরগুলো যেন কোন্ শিল্পীর হাতে আঁকা। তেরো বছরেও ওদের সৌন্দর্য এতটুকু নষ্ট হয়নি। সুমনকে লেখা ওর মায়ের চিঠি! এক ও একমাত্র চিঠি! এটা নিঃসন্দেহে সুমনের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। সবচেয়ে দামি। সুমনের চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। থরথর করে ঠোঁট কাপছে। ও পড়তে শুরু করল ঃ

বাবা সুমন, ইচ্ছে না করলেও অনেক কষ্টে তোকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে রে। তোর বাবা রইলেন, ওঁকে দেখিস। লেখাপড়া করবি মন দিয়ে। কারণ অনেক বড় হতে হবে তোকে, অনেক বড়। এখন তুই বড় হয়েছিস, আমার কথা নিশ্চয়ই বুঝবি। অনেক ত্যাগ স্বীকার করে তোর বাবা তোকে বড় করেছেন। সেই ত্যাগের যথাযোগ্য মর্যাদা তুই দিস। আমি অকালে চলে গেলাম। তোর জন্য কিছুই রেখে যেতে পারলাম না। শুধু অনেক সাধ নিয়ে লেখা এই চিঠিটা ছাড়া। তোকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে রে। ভাল হয়ে থাকিস, সোনা আমার। আজ তাহলে আসি। ইতি—মা-মণি

হলদে বিবর্ণ কাগজে এতখানি স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা থাকতে পারে ভাবতে পারেনি সুমন। ও চোখ তুলে মায়ের ছবির দিকে তাকায়। চোখের জলে ছবিটা ঝাপসা হয়ে গেছে। চোখদুটো জ্বালা করছে। ও টের পেল বাবা ওকে কাছে টেনে নিয়েছেন। মাথায় পিঠে হাত বোলাচ্ছেন। বাবার কোলে মুখ লুকিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে সুমন, "মা, মা-মণি গো, তোমার কথা আমি রাখব। নিশ্চয়ই রাখব। তুমি দেখে নিও।"

সুমন টের পায়, ওর বাবার শরীরটাও ওর মতো থরথর করে কাঁপছে। ওর ছোট্ট মাথা ভিজে ওঠে বাবার চোখের জলে।

ছবি: অনুপ রায়

চার-চিত্র

সাধনা মুখোপাধ্যায়

একটা কুকুর ডাকছিল
দরজা একটু ফাঁক ছিল
তারই মধ্যে নাক ছিল
ফেরিওলা হাঁকছিল।

বাগানে মৌচাক ছিল
মৌমাছিদের ঝাঁক ছিল
ফুলের মধু চাখছিল
থলির মধ্যে রাখছিল।

রাজার মাথায় টাক ছিল
খোকা ছবি আঁকছিল
জামাতে রঙ মাখছিল
মাকে দেখে ঢাকছিল।

দিনের জমক জাঁক ছিল
সূর্য আলো ছাঁকছিল
ছাঁকনি ক্রমে বাঁকছিল
খুকুর হাতে শাঁখ ছিল।

ছবি : দেবাশিস দেব

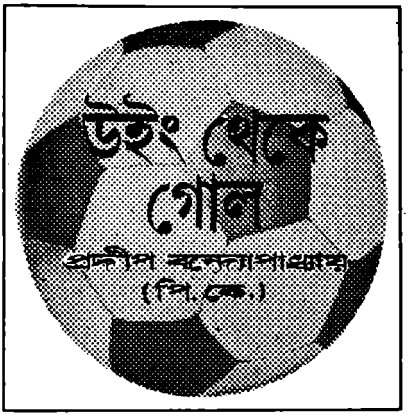

॥ ৩২ ॥

ইস্টার্ন রেলওয়ে ফুটবল টীম নিয়ে চারিদিকে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। বাঙালির ছেলেরা অসাধারণ ফুটবল খেলছে—এই ভাবনা প্রবীণদেরও উৎসাহিত করল।

বিভিন্ন স্কুল থেকে আবেদন আসত, যাতে ছাত্রদের ইস্টার্ন রেলের খেলা দেখার সুযোগ দেওয়া হয়। কে কে দাস, এস দত্ত, অসিত ভাদুড়ি আর বাঘাদা সেইমতো এক-এক দিন এক-এক স্কুলের ছাত্রদের দল বেঁধে খেলা দেখার ব্যবস্থা করে দিতেন। ইস্টার্ন রেল ক্লাবের সদস্যসংখ্যাও পাঁচশো থেকে বেড়ে প্রায় দেড় হাজারে দাঁড়াল। সদস্যদের জন্যই গ্যালারিতে বাড়তি জায়গা কিনতে হত। তার ওপর ছিল স্কুলের ছেলেরা। কে কে দাস বলতেন, যত অসুবিধাই হোক, বাচ্চা ছেলেদের খেলা দেখার সুযোগ দিতেই হবে। ভাল খেলা দেখে ওরা কিছু শিখলে, ভারতীয় ফুটবলই উপকৃত হবে।

খিদিরপুরকে হারালাম ৩—১ গোলে। আমার পাস থেকে প্রথম গোল করলেন সুধীর রায়। আমাকে দ্বিতীয় গোলটি করার রাস্তা গড়ে দিলেন সুধীর রায়ই। এর পর, দিনু দাসের পাস থেকে শেষ গোলটিও আমার পা থেকেই এল।

এর পরের ম্যাচ জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে। 'জায়ান্ট কিলার' হিসেবে বিখ্যাত জর্জ টেলিগ্রাফ দলে তখন একজন ভয়ঙ্কর ডিফেণ্ডার ছিলেন। মনা ঘোষকে কলকাতার সব ফরোয়ার্ডই ভয় পেতেন। পায়ের মায়া কোন্ ফুটবলারের নেই, বলো?

তা, ঐ জর্জ-ইস্টার্ন রেল ম্যাচের আগের দিন মনার সঙ্গে ময়দানে দেখা হল।

"কী প্রদীপ, কেমন আছ?"

"ভাল। কাল তো তোমাদের সঙ্গে খেলা!"

"মারব কাল!"

"লাথি মেরো না, আর সব-কিছু করতে পারো।"

"বেশ, তাহলে আইসক্রীম খাওয়াও।"

আইসক্রীম খেতে খেতে চুক্তি হয়ে গেল, পরদিন লাথি চলবে না!

সুনীল নন্দীর কাছ থেকে বল পেয়ে মনাকে কাটিয়ে খেলার শুরুতেই যে শটটা করলাম, তা অল্পের জন্য বাইরে গেল। কিন্তু শটটা করার পরেই পায়ে যেন 'ইলেকট্রিক শক' খেলাম। তাকিয়ে দেখি, মনা আমার শরীরের ওপর পড়েছে। ওর বুটের স্টাড-এর দাগ আমার থাই-মাস্‌লের পাঁচ-ছয় ইঞ্চি জায়গা জুড়ে। বুঝলাম, আইসক্রীমে কাজ হয়নি!

মনা পেনালটি বক্সের মধ্যে প্রশান্ত সিংহকে ফাউল করায় আমরা পেনালটি পেলাম। কিন্তু পেনালটি কিক ক্রসপীসে লেগে ফিরে এল। পেনালটির সুযোগ কে নষ্ট করল? পি কে ব্যানার্জি!

তারপর সোমের পাস থেকে প্রথম গোল করলেন সুধীর রায়। খেলা শেষ হবার কয়েক মিনিট আগে ডান দিক দিয়ে একের পর এক ডিফেণ্ডারকে কাটিয়ে গোল লাইনে পৌঁছে গেলাম। আমার ব্যাক সেণ্টারে পা ছুঁইয়ে সুনীল নন্দী সহজেই গোল করলেন।

লীগ এগোচ্ছে। মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলও পয়েণ্ট নষ্ট করছে। আমাদের কাজকর্ম-চাকরিবাকরি সব তুচ্ছ হয়ে গেল! ইস্টার্ন রেলের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগের কর্তা ছিলেন কে কে দাস। এই বিভাগে আমি ছাড়াও ছিলেন ক্রিকেটার বাদল চন্দ, বাতু রায়, সব্যসাচী, লেখক মণিশংকর মুখোপাধ্যায় (শংকর), নারায়ণ দত্ত, নীহার দাশগুপ্ত, বীরেন রায় এবং আরও অনেকে। অফিসে তখন শুধু ফুটবলের গল্প। ইস্টার্ন রেল কি সত্যিই লীগ পাবে? শুধু আমাদের অফিসে নয়, রেলের অন্য সব অফিসেও তখন শুধু এই আলোচনা। উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে রেল টীম আই এফ এ

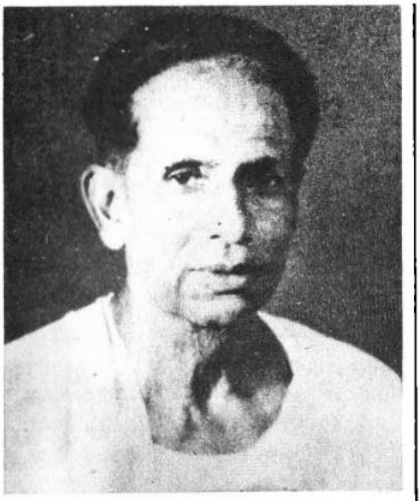

বাঘা সোম

শীল্ড জিতেছিল। তখন নাকি দার্জিলিঙ মেলের সামনে বেঁধে শীল্ডকে উত্তরবঙ্গ সফর করানো হয়েছিল ! এবার লীগ পেলে, কী হবে ?

আমার কাজ ছিল টাইম টেবিলের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা। সবাই চিনতেন। কোনো অসুবিধাই হত না। যেখানেই যেতাম, কাজের কথার পর প্রশ্ন উঠত, "লীগ পাবে তো ?"

ইস্টার্ন রেলের প্রাক্তন সব নামী ফুটবলাররাও তখন এই নিয়েই শুধু কথা বলতেন। দেখা হলেই উৎসাহ দিতেন সিধু মজুমদার, নিলু মুখার্জি, এস নন্দী আর মোহিনী ব্যানার্জি।

রাজস্থানের সঙ্গে আমাদের খেলা ২—২ হল। রাজস্থানের হয়ে গোল করলেন আমজাদ খান আর দামোদরন। আমাদের পক্ষে আমি এবং সুধীর রায়। রাজস্থানের গোলরক্ষক রবীন (নাণ্টা) গুহ দারুণ খেললেন।

এর আগে, ইস্টবেঙ্গলের কাছে আমরা কিন্তু এক গোলে হেরে গিয়েছিলাম। অধিকাংশ আক্রমণই আমরা করছিলাম, কিন্তু গোল করে গেলেন ইস্টবেঙ্গলের লেফট আউট মুসা। আমাকে কড়া নজরে রাখলেন রাম বাহাদুর। তবু, ঐদিন ইস্টবেঙ্গল গোল করার আগে আমি একটা 'গোল' করেছিলাম। 'গোল' ছাড়া কী ? দীনু দাসের সেন্টারে হেড করতেই ইস্টবেঙ্গলের গোলকীপার সনৎ শেঠ কোনোরকমে ফিরিয়ে

দুষ্টু দুটো চড়াই

বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল থেকেই কিচির-মিচির
করছে দুটো চড়াই,
কথায় কথায় ঝগড়া ওদের
হঠাৎ শুরু লড়াই।

বসে ছিল গাছের ডালে
হঠাৎ ঘরে ঢুকে
দাপিয়ে বেড়ায় লাফিয়ে বেড়ায়
টুম্পার সম্মুখে।

টুম্পা বলে, "বোস-না তোরা
গল্প বলি শোন্।"
ফুড়ুত করে পালায় ওরা
ছটফটে এমন।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

দিলেন। বল আবার আমার দিকে এল। এবারের হেড গোলেই ঢুকল। কিন্তু প্রশান্ত সিংহর 'অফসাইড' হয়েছে বলে রেফারী প্রতুল চক্রবর্তী গোল নাকচ করলেন! ইস্টবেঙ্গলের লেফট ব্যাক চিত্ত চন্দ তখন গোললাইনের উপরই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তা ছাড়া, খেলার ওপর সেই মুহূর্তে প্রশান্তর কোনো প্রভাবই ছিল না। লাইনসম্যান অফসাইডের সংকেত দেননি। পরদিনের খবরের কাগজে সরাসরি লেখা হল যে, রেফারীর সিদ্ধান্তে ভুল ছিল। তবে, তখন তো এখনকার মতো বিক্ষোভ জানানোর রেওয়াজ ছিল না। নীরবে সব কিছু মেনে নিয়ে খেলা চালিয়ে গেলাম।

ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ফিরতি লীগের খেলা বৃষ্টির জন্য মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত, ইস্টবেঙ্গল খেলতে না চাওয়ায় সেই খেলা আর হলই না।

তখনও প্র্যাকটিস চলছিল পুরোদমে, বলতে গেলে, আগের চেয়েও বেশি। তিন ঘণ্টা টানা প্র্যাকটিসের পরেও ফ্রী কিকে বা চলতি বলে কতটা সুইং ধরানো যায়—সেই চেষ্টায় মেতে থাকতাম। এই বাড়তি প্র্যাকটিসের সময় দূর থেকে বাঘাদাকে দেখতে পেলেই ছুটে পালাতাম। আসলে, ফুটবল তখন জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

অফিসে আমার সিনিয়র সহায়দা এবং প্রায় সকলেই বারবার জিজ্ঞেস করতেন, "প্রদীপ, প্র্যাকটিস ঠিকমতো হচ্ছে তো? লীগ পাব তো?" ঠিক দুটোর সময় সহায়দা আমাকে ছুটি দিয়ে দিতেন।

মহমেডানের বিরুদ্ধে ফিরতি ম্যাচেও আমরা জিতলাম, ২—১ গোলে। সেইদিন আমি সত্যিই খুব ভাল ফর্মে ছিলাম। মহমেডানের আবিদ গোল করার পর গোল শোধ দিলেন অসীম সোম। দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রী কিক থেকে আমি গোল করলাম। গোলরক্ষক আমেদ আখতার নড়ার সময় পাননি।

মাঝে একদিন বাঘাদা সবাইকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বললেন। কিন্তু নিখিলদা ভোরবেলায় আমাকে ডেকে বললেন, "চল, একটু প্র্যাকটিস করে নিই। নিখিলদা খুব দৌড়তে পারতেন। প্রথমেই বেশ কয়েক পাক দৌড় হল। তারপর, বাঁ দিক থেকে নিখিলদা তুলে দিচ্ছিলেন, আর আমি ভলি মারছিলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টি নামল। অল্প সময়ের মধ্যেই কিছুটা জল দাঁড়িয়ে গেল। নিখিলদা বল তুলে ভলি মারতে লাগলেন, তার ওপর ভলি মারছিলাম আমি। ম্যানশন মাঠের পাশের তেতলার কোয়ার্টার থেকে গার্ড মহিম চ্যাটার্জি উঁকি মেরে বললেন, "তোরা কি মরবি নাকি? এতক্ষণ জলে থাকলে জ্বর হবে না?"

হঠাৎ তাঁকে দেখা গেল। বাঘাদা! শব্দ শুনে চলে এসেছেন। সেই মুখ, যা দেখে সবার বুক কাঁপত। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের কে প্র্যাকটিস করতে বলেছে?"

"না, মানে একটু..."

"বেয়াদপি হচ্ছে? এমন করলে, খেলা একদম বন্ধ করে দেব।"

সব কথাই বললেন নিখিলদাকে। আমার দিকে শুধু তাকালেন। তারপর মাঠের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, "সব প্র্যাকটিস বন্ধ করে দেব!"

ফুলপ্যান্টের ওপর ফতুয়া-পরা বাঘাদার পরিচিত চেহারা অতঃপর অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা দুজনেই তখন থরথর করে কাঁপছি। নিখিলদা বললেন, "বাঘাদা শুধু আমাকেই বকে গেলেন, তোকে কিছু বললেন না, যেন সব দোষ একা আমার!" (ক্রমশ)

কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটে। ছোট্ট ছেলেটি একদিন কাঁদছে একটা পয়সার জন্যে। হয়তো কিছু কিনবে। মা দিতে নারাজ। দেবেন কোথা থেকে? এ যে দিন চলে না মাস বত্রিশ। ছেলেও নাছোড়—একটা পয়সা তার চাই-ই-চাই। এমন সময় বাড়িতে এলেন এক ফকির। তাকালেন ছেলেটির দিকে। অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন, "হায় আল্লা, তোমার কী কেরামতি! তামাম হিন্দুস্থানের বাদশা আজ একটা পয়সার জন্যে কাঁদছে।" সেই ছেলেটি কে জানো? ফরিদ খাঁ—ভারত-ইতিহাসের প্রসিদ্ধ পুরুষ শের শাহ।

আগে যা ঘটেছে : গবা কি সত্যি পাগল? উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধবের ছেলে রামুর গৃহশিক্ষক যুধিষ্ঠির জর্দাপান খায়। গবার ঘরে মধ্যরাতে যে ঢুকেছিল, তার মুখেও জর্দার গন্ধ। কাশিমের চরে হরিহর পাড়ুই খুন হয়। খুনের মামলার জেল-পালানো **আসামি** গোবিন্দ সার্কাসে ছদ্মবেশে খেলা দেখাত। পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় সে গা-ঢাকা দেয়। গবার মাধ্যমে রামু তার সন্ধান পাবার পরে গোবিন্দর গোপন আশ্রয়ে আগুন লাগে। গোবিন্দ বেঁচে গিয়ে গবার সাহায্যে উদ্ধববাবুর বাড়িতে কাজ পায়। উদ্ধবের লোভী কর্মচারী নয়নকাজলকে দলে টেনে ইতিমধ্যে কাকাতুয়া ও রামুকে লুঠ করেছে সাতনা। গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে গবা যায় কাশিমের চরে। সেখানে সে সাংকেতিক গান গেয়ে ডাকাতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তারপর মরতে-মরতে ফিরে আসে। নয়নকাজল অনুতপ্ত। ওদিকে গোবিন্দকে যুধিষ্ঠির জানায়, সে নিহত হরিহরের ছেলে। তারপর···

॥ ২৫ ॥

পরের রাতেও নয়নকাজল এল। রামু ভেবেছিল, বেত খেয়ে নয়নকাজলের বুঝি হয়ে গেছে। কিন্তু মাঝরাতে নয়ন ঠিকই দরজায় শব্দ করল।

রামু উঠে গিয়ে দরজায় মুখ লাগিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে?"

"আমি নয়নদা।"

"উঃ, নয়নদা! তুমি ভাল আছ?"

"ভাল কি আর থাকি? সারা গায়ে কালশিটে, কাঁকালে ব্যথা, চলতে গেলে মাথা ঘোরে।"

"তোমাকে খুব মেরেছে নয়নদা?"

"খুব। মেরেই ফেলত। কিন্তু পাখিটার মুখ থেকে এখনো কথা বেরোয়নি বলে প্রাণটা আমার রেয়াত করেছে।"

"তুমি পালিয়ে যাচ্ছ না কেন নয়নদা? গিয়ে পুলিশে খবর দাও।"

নয়ন একটু দুঃখের হাসি হেসে বলল, "পালালে যদি বাঁচতুম রে ভাই, তবে কি আর চেষ্টা করতুম না! আর পুলিশের কথা কী বলব! আমার মতো গরিব-দুঃখী মানুষের কথায় তারা গা করবে না।"

"তাহলে উপায়?"

"উপায় কিছু দেখছি না। যদি নিতান্ত চুনোপুঁটি ভেবে কখনো ছেড়ে-টেড়ে দেয়। ভগবান ভরসা। তোমার জন্য আজ আর দুধ আনতে পারিনি।"

"দুধ লাগবে না। শোনো নয়নদা, এদের সর্দার যখন আবার আমার কাছে আসবে, তখন আমি তাকে বলে দেব যেন আর কখনো তোমার গায়ে হাত না দেয়। দিলে আমি পাখির মুখ দিয়ে কথা বলানোর চেষ্টা করব না।"

নয়ন একটু অবাক হয়ে বলে, "সর্দার! সর্দারকে তুমি কোথায় দেখলে?"

"কেন, ঐ দানবের মতো লোকটা! সাতনা না কী যেন নাম!"

নয়ন একটা শ্বাস ফেলে বলল, "সাতনা সর্দার টর্দার নয়। তবে মোড়ল গোছের একজন বটে। আসল সর্দার যে কে, তা এরা নিজেরাও ভাল জানে না। যেই হোক তার অনেক ক্ষমতা। তাকে সবাই যমের মতো ডরায়।"

"তুমি সর্দারকে দেখনি?"

"আমি কেন, এরাও অনেকে দেখেনি। ওসব নিয়ে ভেবো না। সাতনাকে আমার কথা বললে হিতে বিপরীত হবে। এখন ছেড়ে রেখেছে, তুমি কিছু বললে হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে রাখবে।"

"তাহলে বলব না। কিন্তু এই যে তুমি আমার কাছে এসেছ, যদি ধরা পড়ে যাও?"

"সে ভয় খুব একটা নেই। তোমার ওপর এরা এমন কড়া নজর রাখছে না। তুমি ছোট ছেলে, দরজা ভেঙে পালাতে তো পারবে না, আর পালালেই বা যাবে কোথায়? চারদিকে জঙ্গল।"

"এখানে ওরা কজন আছে?"

"বেশি নয়। তবে সব সময়েই লোক আনাগোনা করে। বিরাট কাণ্ড। কোদাল গাঁইতি দিয়ে চারদিকে খুব খোঁড়াখুঁড়িও হচ্ছে গুপ্তধনের জন্য।"

"কিছু পেয়েছে?"

"না, পাওয়া বড় সহজ নয়।"

"পাখিটা কোথায়?"

"সে খুব ভাল জায়গায় আছে। আমাদের নাগালের বাইরে।"

রামু উত্তেজিত গলায় বলল, "শোনো নয়নদা, আমাদের যেমন করে হোক, পালাতেই হবে। এখানে থাকলে তুমি বা আমি কেউই হয়তো বেঁচে থাকব না।"

"পালাবে? ও বাবা!"

"ভয় পাচ্ছ কেন? মরার চেয়ে তো পালানো ভাল।"

"তা ভাল, কিন্তু...."

"কিন্তু-টিন্তু নয়। ভাল করে দ্যাখো, এ-ঘর থেকে বেরোনোর কোনো উপায় আছে কি না।"

"দেখেছি। নেই।"

"ছাদে উঠতে পারো?"

"তা পারি।"

"আর-একটা দড়ি লাগবে।"

"তাও জোগাড় হবে। কিন্তু অত সাহস ভাল নয়। শুনেই আমার হাত-পা কাঁপছে।"

"শোনো নয়নদা, না পালালেও এরা রেহাই দেবে না। আমাকে যদি নাও মারে, তোমাকে মারবে। কারণ তুমি বড় মানুষ, ওদের অনেক গোপন খবর জেনে গেছ। কাজেই তোমার না পালিয়ে উপায় নেই। যদি দুজনে পালাতে পারি, তবে আমি বাবাকে গিয়ে সব বলব। বাবা পুলিশের কাছে গেলে পুলিশ কিছু না-করে পারবে না। তা ছাড়া গোবিন্দদা আর গবাদা আছে। ওরা ঠিক একটা বুদ্ধি বের করবে।"

নয়ন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "কিন্তু পালানোর উপায়টা কী ভেবেছ?"

"খুব সোজা। দক্ষিণ দিকে ছাদের কাছে একটা বড় ঘুলঘুলি আছে। অবশ্য অনেক উঁচুতে। ঘুলঘুলিতে পাতলা তারের জাল দেওয়া। জালটা পুরনো হয়ে মরচে পড়ে পচে গেছে। তুমি ছাদে উঠে কার্নিশে ভর দিয়ে ওই ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে দড়ি নামিয়ে দেবে। আমি দড়ি ধরে উঠে যাব।"

"পারবে? পড়ে যাবে না তো?"

"না না। আমি গোবিন্দ-মাস্টারের কাছে অনেক তালিম নিয়েছি। কিন্তু তুমি খুব সাবধান।"

"আজ রাত্রেই পালাবে নাকি?"

"আজ, এক্ষুনি। কাল আবার কী হয় কে জানে।"

"আমার বড় ভয় করছে রামু। পুরনো কার্নিশ ভেঙে যদি পড়ে যাই?"

"কার্নিশ যদি পুরনো হয় তাহলে ছাদের রেলিং বা শক্ত কিছুতে দড়িটা বেঁধে নিজের কোমরে জড়িয়ে নিও। পড়বে না। কিন্তু সাবধান। শব্দ-টব্দ কোরো না।"

"আচ্ছা। কিন্তু পারবে তো রামু?"

"আমি পারব। তোমাকেও পারতে হবে।"

"দেখি তাহলে।" মিনমিন করে এই কথা বলে চলে গেল নয়ন।

রামু শীত তাড়ানোর জন্য কয়েকটা ডন-বৈঠক করল। স্কিপিং-এর ভঙ্গিতে নেচে মাংসপেশীর আড় ভেঙে নিল। গা গরম করে না নিলে হঠাৎ কঠিন পরিশ্রম করতে গিয়ে পেশীতে টান ধরে যায়। গোবিন্দদা তাকে অনেক কটা কসরত শিখিয়েছে। সবই ফ্লোর একসারসাইজ। তার কয়েকটা করে নিল রামু।

তারপর কম্বল মুড়ি দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। অন্ধকার ঘরে ঘুলঘুলিটা খুব আবছা দেখা যায়। অনেকটা উঁচুতে। খুব বড় ঘুলঘুলি নয় বটে, তবে রামু গলে যেতে পারবে। কিন্তু কথা হল, নয়নকাজল পারবে কি না কার্নিশে নামতে। একে ভিতু মানুষ, তার ওপর নয়ন তো আর খেলাধুলো করে না।

*

ওদিকে নয়ন পড়েছে মুশকিলে। একতলার একটা ঘরে মেলা দড়িদড়া শাবল খন্তা মজুত থাকে। দরজায় তালাও নেই। সে নিঃশব্দে গিয়ে একটা দড়ি বের করে এনেছে বটে, কিন্তু বাকি কাজ করতে ভয়ে তার হাত-পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

দালানের মধ্যে তেমন পাহারা নেই। পাহারা আছে বাড়ির চারধারে। কোনো দরজা বা ফটক দিয়ে বেরোনোর উপায় নেই। আর নীচের তলার ঘরে দোর দিয়ে অনেক লোক ঘুমোচ্ছে।

দোতলাতেও গোটা দুই-তিন ঘরে লোক আছে। সাড়াশব্দ হলে তারা জেগে যেতে পারে।

নয়ন পা টিপে টিপে ছাদে উঠল। আজও কুয়াশা আছে, শীতও সাংঘাতিক। তবে মাঝরাতে একটু চাঁদের উদয় হয়ে থাকবে। অন্ধকারটা তেমন জমাট নয়। একটু ফিকে ভাব। মস্ত ছাদখানা অনেকটা দেখা যাচ্ছে। বিস্তর আজে-বাজে জিনিস পড়ে আছে ছাদে। পুরনো পিপে, পাথরের মূর্তি, ভাঙা ইঁট, ভাঙা দরজা-জানালার কাঠ।

নয়ন ঠাহর করে রামুর ঘরটা কোথায় তা আন্দাজ করল। রেলিং দিয়ে ঝুঁকতে নীচের দিকে চেয়ে মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল তার। এই এত উঁচু থেকে যদি পড়ে যায় তো মাথাটি আস্ত থাকবে না। অনেকক্ষণ চোখ বুজে একটু ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করল সে।

তারপর চোখ খুলতেই বুকের মধ্যে একটা চড়াই পাখি উড়াল দিল যেন।

সামনে একজন লোক দাঁড়িয়ে।

দাঁতে-দাঁতে কত্তাল বাজছিল নয়নের। সে 'বাবা-গো' বলে ফের চোখ বুজে ফেলল।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, "কে তুই?"

"আজ্ঞে আমি দলের লোক।"

"এখানে কী করছিস?"

"আজ্ঞে পাহারা দিচ্ছিলাম।"

লোকটা অবাক হয়ে বলল, "ছাদে তো আমার ডিউটি। তুই এলি কোত্থেকে? হাতে দড়িই বা কেন?"

নয়ন একটু সাহস করে বলল, "যদি কাউকে ধরে ফেলি তো বাঁধতে হবে না?"

"ওঃ, তাই বল!" বলে হঠাৎ লোকটা হাসতে-হাসতেই ঠাস করে একটা চড় কষাল নয়নের গালে। সেই চড়ে চোখে ফুলঝুরি দেখতে লাগল নয়ন। বাপ রে, কী চড়!

(ক্রমশ)

ছবি দেবাশিস দেব

শুরু হল নতুন গল্প...

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

হেনরী
© 1981 King Features Syndicate, Inc. World rights reserved.

জিভের কুঁড়েমি

বাচস্পতি

"স্বরধ্বনির টাঁগ-অব-ওয়ার মানে—" বাবা খুব অবাক।

হিগিনকাকু বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বললেন, "ঐ যে ছকটা করে দিয়েছি, লক্ষ করো

ই   উ
এ   ও
অ্যা আ অ

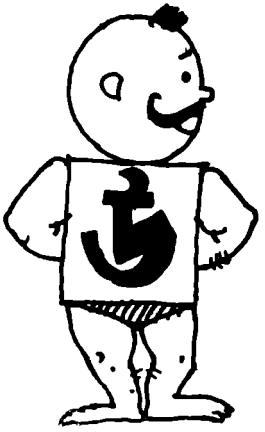

এর মধ্যে দুজনের গায়ের জোর সব চাইতে বেশি। এনারা হচ্ছেন 'ই' আর 'উ'। এঁরা উঁচুতে থাকেন তো।"

ভণ্টু বলল, "হ্যাঁ, তার মানে এ-দুটোই [+উর্দ্ধ] স্বরধ্বনি।"

"আঁফাঁ তেরিব্‌ল!" ফরাসিতে "বিচ্ছু ছেলে!" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন হিগিনকাকু, "ঠিক ধরেছিস। এখন এইভাবে ভেবে দ্যাখ, যে এঁরা উঁচু লোক, মানী লোক। এঁদের আশেপাশে যে-সব স্বরধ্বনি থাকে তারা এঁদেরই কাছ ঘেঁষতে চেষ্টা করে—এঁরা কিন্তু উঁচু আসন থেকে নামেন না।"

বাবা বললেন, "সে তো তুই ভণ্টুকে বোঝানোর জন্যে রূপক দিয়ে বলছিস, কিন্তু এর নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে একটা?"

"আরে সেটা একটা কাণ্ড। ঐ যে জিভ, এটা খানিকটা তার দুষ্টুমি বলতে পারো। সে ভাবে, 'যারা উঁচু স্বরধ্বনি, তাদের উচ্চারণ আমাকে করতেই হবে, ওপরে তো উঠতেই হবে। এখন তার আগেই যদি এমন স্বরধ্বনি থাকে যা উঁচু নয়, অর্থাৎ [– উর্দ্ধ], যার মধ্যে পড়ছে 'এ, ও, অ্যা, আ, অ' বাকি সবগুলোই—তাদের উচ্চারণ করতে হয় একটু নিচুতে থেকে। তাই তো?"

ভণ্টু বলল, "হ্যাঁ, 'এ-ও'র বেলায় মাঝামাঝি, আর 'অ্যা-আ-অ'র বেলায় নিচুতে থাকে জিভ।"

"এবার বোঝো, পরে 'ই-উ' থাকলে জিভকে খানিকটা নিচু থেকে ওপরে উঠতে হয় লাফ দিয়ে। ধরো 'ঘট' কথাটা। এটা হল ঘ্‌+অ+ট্‌। এখন তার সঙ্গে 'ই' লাগালে 'ঘটি' হবে। তখন ঘ্‌+অ+ট্‌+ই। এতে জিভকে নিচুতে 'অ' বলে পরে উঁচুতে 'ই' বলতে যেতে হবে, বুয়েচ তো? এখন জিভ ভাবে, 'মহা মুশকিল, অত পরিশ্রম করব কেন? তার চেয়ে আগেই একটু উঠে থাকি না!' ফলে সে 'ও'র জায়গায় উঠে গিয়ে পরে 'ই' বলবার জন্যে তৈরি হয়। তাই যা হওয়া উচিত ছিল ঘ্‌+অ+ট্‌+ই, তা হয়ে যায় ঘ্‌+ও+ট্‌+ই। অর্থাৎ 'ঘোটি'।"

বাবা বললেন, "তার মানে জিভ শর্টকাট করছে একটা, কী বলিস?"

"মহা ফাঁকিবাজ এই জিভ। আমাদের বাঙালভাষায় যাকে বলে কর্মচোরা!" হিগিনকাকু বললেন মাথা ঝাঁকিয়ে।

(ক্রমশ)

চম্বলের সঙ্গে বাবা

প্রসাদ

এ-বছর পুজোর ছুটিতে কোথাও যাওয়া হল না। মোটামুটি ঠিকই হয়ে গিয়েছিল পশ্চিম ভারতে যাওয়া হবে। বাবা নানা রকম বইপত্তর কাগজ-টাগজ আনিয়ে সেখানকার নানা জায়গার কথা, ইতিহাস ভূগোল এইসব পড়তে আর সকলকে পড়াতে আরম্ভ করেছিলেন। এমন সময় কী যে হল। বাবা হঠাৎ একদিন রাতে বললেন, বুকে ব্যথা। ডাক্তার এলেন। বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। সেখানে ক'দিন থেকেই অবশ্য ফিরে এলেন বাড়িতে, কিন্তু ডাক্তার বললেন, একমাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম, নড়া-চড়া একদম বন্ধ। এখন বাবা ভাল হয়ে উঠেছেন, চলাফেরা করছেন। এখন আবার চম্বলের ভাল লাগছে। কিন্তু সেই দিনগুলোর কথা ভাবতে একদম ইচ্ছে করে না। চামেলি মাঝে-মাঝে দু-একটা কথা দাদাকে জিজ্ঞেস করে; বাবার অসুখের কথা, হাসপাতালের কথা। কিন্তু চম্বল যত সংক্ষেপে পারে, তার উত্তর দিয়ে অন্য কথা পাড়ে।

Chambal doesn't like to talk about those days.

He prefers not to think about them.

Sometimes he pretends not to hear Milly's questions about Father's illness.

He begins to talk about something else.

Mother noticed this and talked to Father about it.

Father didn't like it at all.

Milly heard Father say so.

"Children must learn to face facts," he said. "It's no use trying to run away from them."

"What do you intend to do about it ?" Mother asked.

"I intend to talk to him."

"Or would you like *me* to talk to him, instead ?" said Mother.

"No, no," Father said, "I'd rather do the talking myself."

So it came about that Father stopped Chambal as he was rushing out to meet his friends on the afternoon of the following Sunday.

"Just a minute, Chambal. I want a word with you. Sit down, will you ?"

Chambal sat down on the edge of the chair.

"Did you remember to post the letter I gave you the other day ?"

"Yes, Dad."

"Good. I knew I could depend on you. I hope you know that I'll have to depend on you more and more as both of us grow older. For example, you must know what to do in case I should fall ill again. By the way, do you know what my last illness was ?"

"I've no clear idea, Dad."

"I propose to give you a very clear idea about it now. Will you take that large book in the blue cover down from the shelf ?"

প্রজাপতি প্রজাপতি দেখ লক্ষীটি.
আমার বাগান, ফুল আর আমি—তোমার পুরোন বন্ধুটি
প্রজাপতি প্রজাপতি জেম্‌স নাও এসে
তুমি আমি আর সব বন্ধু মিলে খাই ভালবেসে !

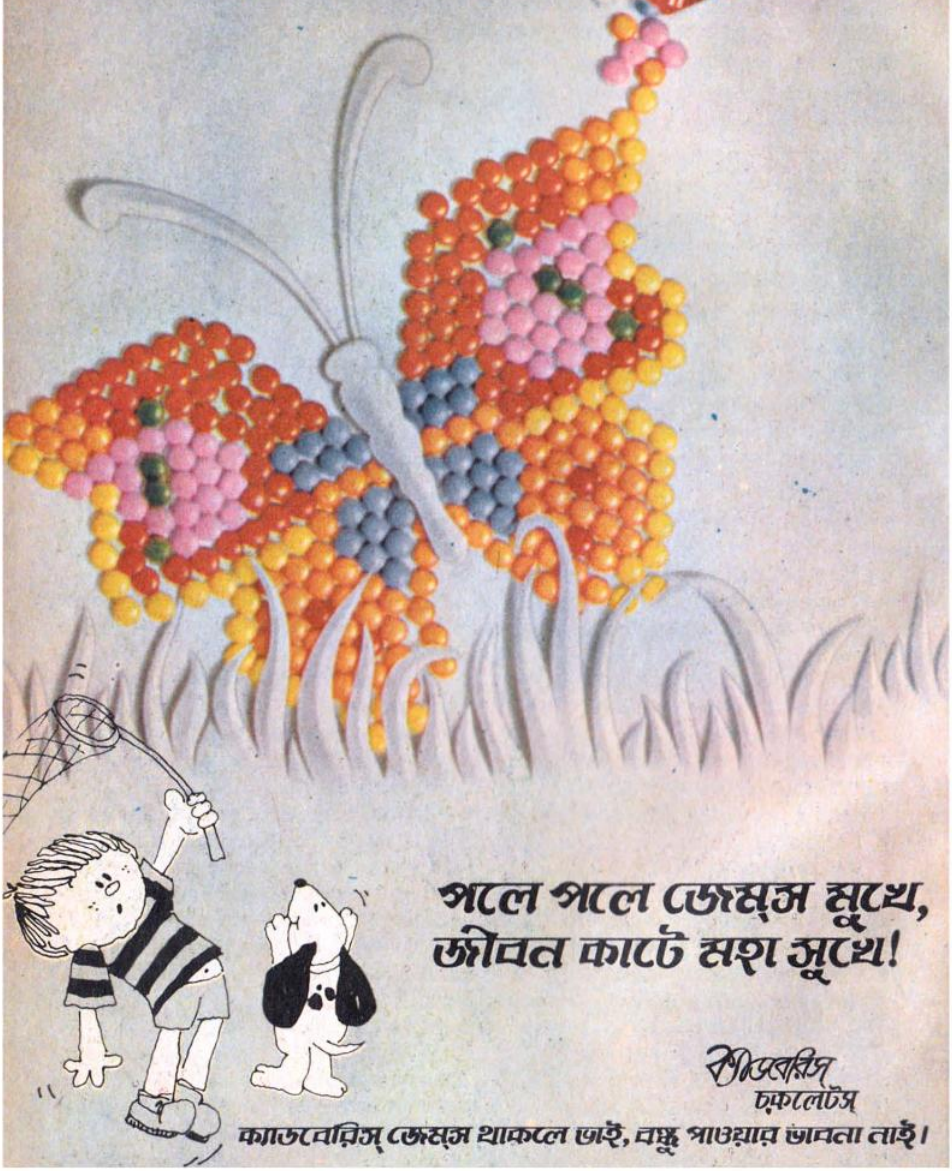

পলে পলে জেম্‌স মুখে,
জীবন কাটে সুখে সুখে!

ক্যাডবেরিস্
চকলেটস্

ক্যাডবেরিস্ জেম্‌স থাকলে ভাই, বন্ধু পাওয়ার ভাবনা নাই।

বাঘা

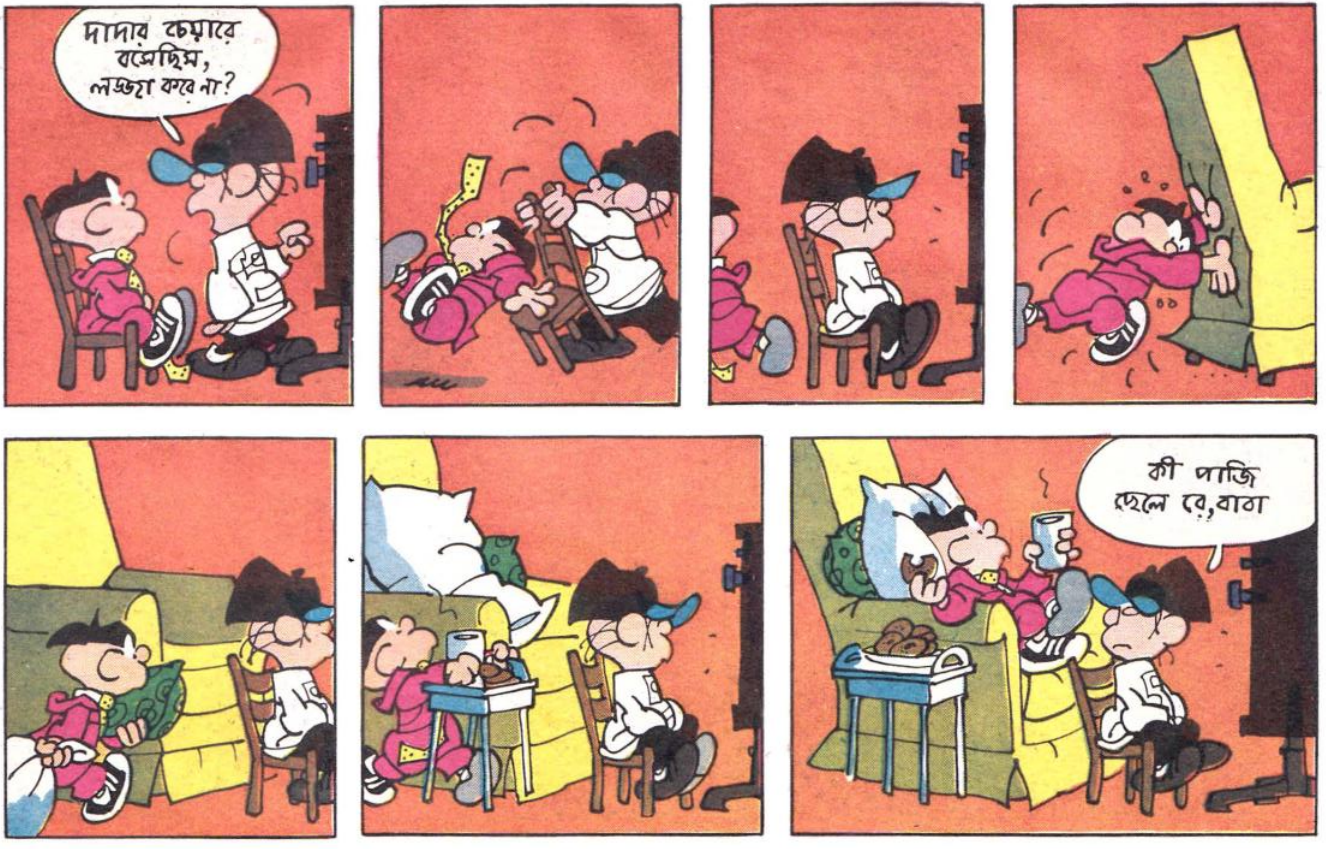

প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের পাশে
আমরা ছিলাম আছি থাকবো
Nias/813
সঞ্চয়নী সেভিংস এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিঃ
রেজিঃ অফিস ৮২/২এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪ ফোন নং ৫৫-৫০১৭

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী!

সুপার রিন-এর নিয়মিত ব্যবহার আপনার জামাকাপড়ের চেহারাকে পাল্টে এমনই চমক্‌দার করে তুলবে যা দূর থেকেও নজরে পড়বে!

সুপার রিন—অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার বা বারে কাচা কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী ঝক্‌ঝকে সাদা ক'রে ধোয়। কারণ, সুপার রিন-এর শুভ্রতা আনার শক্তি যে অনেক বেশী!

চাক্ষুষ প্রমাণ করে নিন:

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট বারে ধোয়া

সুপার রিন-এ ধোয়া

সুপার রিন-এ আছে শুভ্রতা আনার অনেক বেশী শক্তি!

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RIN.40-1810 BG

সবুজ
রুপোলী
কমলা
রুপোলী
লাল
রুপোলী
হলদে
ঠকে যেও না!
আসলে পপিন্স প্যাক
— এখন থেকে রুপোলী স্ট্রাইপও থাকবে!
বাচ্চারা, তোমাদের জন্যে এক মিষ্টি খবর! জালিয়াতরা তোমাদের আর ঠকাতে পারবে না। পার্লে পপিন্স কেনবার আগে দেখে নাও, রঙ-চঙে প্যাকে রুপোলী স্ট্রাইপ'ও আছে কি-না! থাকলেই বুঝবে, ওটা আসল পপিন্স। ব্যস, আর কি, ফলের স্বাদে ভরা পপিন্স মুখে ভরে রাখ, আর কেবলই চাকুম-চুকুম চাখ!
আসলে পপিন্স যদি খেতে চাও, প্যাকে রুপোলী স্ট্রাইপটিও দেখে নাও!
পার্লে
পপিন্স
এখন, জালিয়াতদের কোনো চালাকি চলবে না!
PARLE
POPPINS